وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আনাস ইবনু মালেক ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না নিজের জন্য যা পছন্দ কর তা অন্য ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫)।

● ৬ষ্ঠ বর্ষ ● ১১তম সংখ্যা ● সেপ্টেম্বর ২০২২

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٦، صفر و ربيع الأول ١٤٤٤ هـ / سبتمبر ٢٠٢٢م العدد:١١، الجزء: ٧١
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

জুমেইরাহ মসজিদ, দুবাই, আরব আমিরাত : দুবাইয়ের অন্যতম দৃষ্টিনন্দন এই মসজিদটি ১৯৭৯ সালে নির্মিত হয়। মিশরের ফাতেমীয় স্থাপত্যশৈলিতে নির্মিত মসজিদটিতে ১৩০০ মুছল্লী একসাথে ছালাত আদায় করতে পারে। মসজিদটিতে দুটি সুউচ্চ মিনার ও মধ্যযুগীয় মুসলিম রীতিতে নির্মিত ৫টি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদটিতে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে দর্শনার্থীরা ইসলাম ধর্ম ও আমিরাতী জীবনধারা সম্পর্কে জানতে পারে।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৪ ‖ ঈসায়ী ২০২২ ‖ বঙ্গীয় ১৪২৯

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ সেপ্টেম্বর	০৪ ছফর	বৃহস্পতিবার	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৭	০৭:৩৪
০৫ ,,	০৮ ,,	সোমবার	০৪:২৫	০৫:৪১	১১:৫৭	০৩:২৫	০৬:১৩	০৭:২৯
১০ ,,	১৩ ,,	শনিবার	০৪:২৭	০৫:৪৩	১১:৫৫	০৩:২৩	০৬:০৮	০৭:২৪
১৫ ,,	১৮ ,,	বৃহস্পতিবার	০৪:২৯	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৩	০৭:১৮
২০ ,,	২৩ ,,	মঙ্গলবার	০৪:৩১	০৫:৪৬	১১:৫২	০৩:১৮	০৫:৫৮	০৭:১৩
২৫ ,,	২৮ ,,	রবিবার	০৪:৩৩	০৫:৪৮	১১:৫০	০৩:১৫	০৫:৫২	০৭:০৭

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	-২	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	-১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	-১
গোপালগঞ্জ	+৩	+৩	+২
মাদারীপুর	+২	+১	+১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২
শরিয়তপুর	+১	০	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-১	-১	+১
শেরপুর	০	০	+২
জামালপুর	০	+১	+৩
নেত্রকোনা	-৩	-১	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৪	-৫	-৫
কক্সবাজার	-৩	-৫	-৫
খাগড়াছড়ি	-৫	-৬	-৬
রাঙ্গামাটি	-৮	-৬	-৬
বান্দরবান	-৭	-৬	-৬
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩
নোয়াখালী	-২	-২	-২
লক্ষীপুর	-১	-১	-১
চাঁদপুর	০	-১	-১
ফেনী	-৩	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৭	-৫
সুনামগঞ্জ	-৬	-৫	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৬	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৪	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+৯
নাটোর	+৫	+৫	+৬
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৩
বগুড়া	+৩	+৩	+৫
নওগাঁ	+৪	+৫	+৭
জয়পুরহাট	+৪	+৪	+৭

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+২	+৩	+৬
দিনাজপুর	+৪	+৫	+৮
গাইবান্ধা	+১	+২	+৫
কুড়িগ্রাম	০	+১	+৫
লালমনিরহাট	+১	+২	+৬
নীলফামারী	+২	+৫	+৮
পঞ্চগড়	+৪	+৫	+৯
ঠাকুরগাঁও	+৪	+৬	+১০

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৫	+৪	+৪
বাগেরহাট	+৪	+৩	+৩
সাতক্ষীরা	+৭	+৬	+৬
যশোর	+৬	+৫	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭
মাগুরা	+৪	+৪	+৫
নড়াইল	+৪	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+২	+১	০
পটুয়াখালী	+২	+১	-১
পিরোজপুর	+৩	+২	+১
ঝালকাঠি	+২	+২	০
ভোলা	+১	+০	-২
বরগুনা	+৩	+২	০

৬ষ্ঠ বর্ষ
১১ম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০২২
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৯
ছফর-রবীউল আউয়াল
১৪৪৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

■ **প্রধান সম্পাদক,**
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

■ ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৪০৭-০২১৮২২

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৪০০/-	৮০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দারসে হাদীছ**
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব ০৩
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ **প্রবন্ধ**

» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-৪) ০৫
মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া (পর্ব-৭) ০৮
-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী

» উপেক্ষিত ধর্ম, নির্বাসিত মূল্যবোধ (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১১
-ড. মো. কামরুজ্জামান

» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-১০ম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-১৭তম পর্ব) ১৫
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» দাজ্জাল সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা (পর্ব-৪) ১৮
-আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী

» প্রসঙ্গ : ছফর মাসকেন্দ্রিক জাহেলিয়াত, অশুভত্ব, কুসংস্কার এবং আখেরী চাহার শোম্বা বিষয়ক বিদআত! ২১
-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন

» মাযারে দান-ছাদাক্বা : ইসলাম কী বলে? ২৪
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

» ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের একাল-সেকাল ২৬
-মো. হাসিম আলী

◈ **হারামাইনের মিম্বার থেকে** ২৮
» আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান : মর্যাদা, ফযীলত ও ফলাফল
-অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী

◈ **তরুণ প্রতিভা**
» আল-কুরআন : আঁধারের মাঝে এক দীপ্তি ৩১
-সাব্বির আহমাদ

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ**
» হঠাৎ লোডশেডিং ভয়াবহভাবে বেড়ে গেল কেন? ৩২
-জুয়েল রানা

◈ **দিশারী**
» হে যুবক! কখনো কি সময়ের হিসাব করেছ? ৩৪
-জাবির হোসেন

◈ **জামি'আহ পাতা**
» আল-কুরআনে মৌমাছি ও মাকড়সা ৩৭
-আব্দুর রাযযাক বিন মাসির

◈ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান**
» আতরওয়ালা বন্ধু ৩৯
-মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান

◈ **কবিতা** ৪১

◈ **সংবাদ** ৪২

◈ **সওয়াল-জওয়াব** ৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকটে দেশ

দেশে যে ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকট চলছে, তা লিখে পাঠককে বুঝানোর দরকার নেই। কারণ সকলেই ভুক্তভোগী। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং হচ্ছে। সরকারের হিসাব মতে, সারাদেশে বিদ্যুতের যে চাহিদা রয়েছে, উৎপাদন হচ্ছে তার চেয়ে প্রায় ৯ শতাংশ কম, যা লোডশেডিং-এর মাধ্যমে সমন্বয় করতে হচ্ছে। ফলে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ছে। দীর্ঘ লোডশেডিংয়ের কারণে প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ, বৃদ্ধ ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। শিল্প, কৃষি, ব্যবসায় সর্বক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। কল-কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হলে বিদেশে পণ্য রপ্তানি ঝুঁকিতে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিদ্যুতের অভাবে সেচপ্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ায় চলতি আউশ মৌসুমের আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও এর বিরূপ প্রভাব সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। কারণ বিদ্যুৎবিভ্রাটে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। এককথায় বিদ্যুতের অভাবে চারিদিকে হাহাকার ও স্থবিরতা বিরাজ করছে।

গ্যাস স্বল্পতার কারণেই মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাস ও জ্বালানির উচ্চমূল্য অন্য দেশের মতো বাংলাদেশকেও সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। ফলে এ যুদ্ধের প্রভাবে অন্য অনেক দেশের মতো বিদ্যুৎ সংকটে পড়েছে বাংলাদেশও। আন্তর্জাতিক বাজারে বিদ্যুতের অন্যতম কাঁচামাল এলএনজির দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় আমদানি একদমই কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা প্রায় বন্ধ করা হচ্ছে। ফলে তীব্র জ্বালানি সংকটে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে পারছে না। গ্যাস সংকটের কারণে প্রতিদিন গড়ে ৮০০ থেকে ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। আগে গ্যাসের সংকট সৃষ্টি হলে তেল বা কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বাড়ানো হতো। কিন্তু গ্যাসের মতো আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যও বৃদ্ধির কারণে সেটাও সম্ভব হচ্ছে না।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এ সংকটের মূল কারণ হিসেবে উঠে আসলেও রেন্টাল ও কুইক রেন্টালকেও দুষছেন অনেক বিশেষজ্ঞই। দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা এখন সাড়ে ২৫ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। দৈনিক চাহিদা ১৪ হাজার মেগাওয়াটের কাছাকাছি। এই বিদ্যুৎ চাহিদা স্থায়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে মেটানো সম্ভব। তাহলে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল থেকে অতিরিক্ত মূল্যে বিদ্যুৎ কেনা হবে, সে প্রশ্ন অনেকেরই। তাছাড়া ক্যাপাসিটি চার্জের নামে বিদ্যুৎ খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে সরকারকে। একটি সূত্র মতে, 'দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা এখন সাড়ে ২৫ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। দৈনিক চাহিদা ১৪ হাজার মেগাওয়াটের কাছাকাছি। এই বিদ্যুৎ চাহিদা স্থায়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে মেটানো যাচ্ছে। তারপরও তিন বছরের চুক্তিতে আনা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধ করা হচ্ছে না। স্বল্প মেয়াদের কথা বলে এক যুগ ধরে ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কেনা হচ্ছে বাড়তি দামে। বিদ্যুৎ না নিলেও এসব কেন্দ্রকে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয়েছে' *(মানবজমিন, ২২ জুলাই)*। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভাড়াভিত্তিক রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বিদ্যুৎব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং তা কখনই স্থায়ী সমাধান নয়।

এক্ষণে, (১) সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন ও মিতব্যয়ী হতে হবে। দরকারের বাইরে সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎও কোথাও খরচ করা যাবে না। বিদ্যুৎ স্টোর করে রাখার মতো কোনো ভোগ্যপণ্য নয়। বরং চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন করতে হয়। ফলে উৎপাদন কম হলে লোডশেডিং অপরিহার্য। সেজন্য কারো বিলাসিতা ও অপচয় অন্যের দুর্ভোগের কারণ। সঠিক ব্যবস্থাপনা ও অপচয় রোধ করা গেলে জনদুর্ভোগকে কিছুটা সহনীয় মাত্রায় রাখা যাবে। এক্ষেত্রে অপচয়ও ইসলামনিষিদ্ধ অপচয়ের আওতায় পড়বে। (২) সর্বপ্রকার আলোকসজ্জা বন্ধ রাখতে হবে। নৈশকালীন প্রোগ্রামগুলো, যেখানে প্রচুর বিদ্যুৎ ব্যয় হয়, দিনে করতে হবে। বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান সন্ধ্যার আগেই শেষ করতে হবে। (৩) বিদ্যুৎখাতের যাবতীয় অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে পাওয়া অবৈধ লাইনগুলো বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং সিস্টেম লস সর্বোচ্চ কমিয়ে আনার উপর জোর দিতে হবে। (৪) দেশীয় উৎপাদন বাড়িয়ে ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করতে হবে। কয়লাভিত্তিক নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র বিকল্প হতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র দেশবাসীকে আশার আলো দেখাচ্ছে। (৫) নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানে গুরুত্ব বাড়াতে হবে। কারণ আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর অনাবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে, বিশেষ করে সমুদ্র এলাকায়। ফলে বাপেক্সকে আরো শক্তিশালী করে অনুসন্ধান কাজে জোর দিতে হবে। (৬) সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও এর ব্যবহার বাড়াতে হবে। স্বল্প আয়ের মানুষের মাঝে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াতে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা থাকতে হবে। (৭) এনার্জি সেভিংস বাল্ব ব্যবহারে জনগণকে আগ্রহী করে তুলতে হবে এবং স্বল্প মূল্যে সাধারণ জনতার দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

মহান আল্লাহ দ্রুত সমস্যা কাটিয়ে আমাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনুন। আমীন!

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব

-মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

সরল অনুবাদ : আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছে আমি তার পিতা, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হব’।[১]

ব্যাখ্যা : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ছাহাবীদের যে ভালোবাসা ছিল, তা ছিল আবেগময়, হৃদয়স্পর্শী ও অকৃত্রিম। তা ছিল গভীর ভালোবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত, হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান পাওয়া অপূর্ব নিদর্শন; তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের এক বিরল দৃষ্টান্ত।

এ ভালোবাসা ছিল নিখাদ, এ ভালোবাসা ছিল হৃদয় নিংড়ানো। ভালোবাসা ছিল সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত, দুধের ন্যায় সাদা, স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, ইস্পাতের ন্যায় কঠিন, পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় সুউচ্চ। এ ভালোবাসা স্রেফ আবেগনির্ভর কিংবা কৃত্রিম আবেশের ছোঁয়ায় আবর্তিত নয়, এ ভালোবাসা দুনিয়াবী জীবনের তুচ্ছ প্রাপ্তি কিংবা লোভ-লালসার উপর ভিত্তিতে হয়নি।

ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত ইলাহী প্রেমে সিক্ত ছিল এ ভালোবাসা। এ ভালোবাসার সুধায় সিক্ত ব্যক্তি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে কিংবা জীবন বিসর্জন দিতে কিংবা অসাধ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। ভয়াবহ সংকট, প্রচণ্ড আঘাত, অঙ্গহানী কিংবা ক্রমাগত বিপর্যয় এ ভালোবাসায় ফাটল সৃষ্টি করে না; বরং আরও দৃঢ়, নিবিড় ও গভীর হয়। আল্লাহকে পাওয়ার সুধায় পরিতৃপ্ত হওয়ার আশা এই ভালোবাসাকে লালন করে, তাঁকে দর্শনে মুগ্ধ হওয়ার সুপ্ত স্বপ্ন এ ভালোবাসাকে প্রতিপালন করে। যে ভালোবাসা জীবনের সকল প্রাপ্তির উৎস; যে ভালোবাসা জীবনের সকল সাফল্যের মূলমন্ত্র।

এ ভালোবাসার ক্ষেত্রে উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মতো বিচক্ষণ ছাহাবী ভুল করায় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে সতর্ক করেন। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি আমার কাছে আমার জীবন ব্যতীত সবকিছুর চেয়ে প্রিয়। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয় হব। তখন উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, হে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর কসম! আপনি এখন আমার কাছে আমার জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয়। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, হে উমার! এখন তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হয়েছে।[২]

তাঁরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে এত বেশি ভালোবাসতেন যে, তাঁর উপর সম্ভাব্য যে কোনো বিপদ বা সমস্যাকে প্রতিহত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। এক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের জীবন বাজি রাখতেন। তাঁর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাঁরা জীবন উৎসর্গের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘনিষ্ঠ ছাহাবী আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু মাসজিদে হারামের এক কোণে বসে আছেন, এমন সময় কুরাইশদের অন্যতম নেতা উক্ববা ইবনে আবূ মুইত্বকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দিকে অগ্রসর হতে দেখতে পেলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাত আদায় করছিলেন। আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি দেখলেন যে, সে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে তাঁকে প্রচণ্ডভাবে শ্বাসরোধ করে চেপে ধরেছে। এ অবস্থা দেখে আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু দ্রুত গতিতে সেখানে উপস্থিত হন এবং কঠোরভাবে তাকে প্রতিহত করেন। ফলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি লাভ করেন।[৩] অতঃপর আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলতে থাকেন, তোমরা কি এমন একজন মানুষকে শুধু এজন্য হত্যা করতে চাও যে, তিনি বলেন, ‘আমার রব আল্লাহ, অথচ তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন?’ *(গাফির, ৪০/২৮)*।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গ পাওয়া ছাহাবীদের নিকট সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয় ছিল। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করার জন্য তাঁরা সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। যখনই তাঁরা সুযোগ পেতেন, তখনই তাঁর সাক্ষাতের জন্য ছুটে যেতেন। কেননা তাঁর অনুপস্থিতি তাঁদের নিকট সবচেয়ে বড় বিরহের কারণ ছিল। তাঁকে অপ্রাপ্তি সর্বদা তাঁদেরকে আহত করত। যখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাঁর সাথে বের হয়ে তাঁকে উপদেশ দিতে থাকেন। মুআয রাযিয়াল্লা-হু আনহু যখন বাহনে আরোহী ছিলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাহনের নিচে দিয়ে হাঁটছিলেন। উপদেশ দেওয়ার শেষ প্রান্তে বলেন, হে মুআয! সম্ভবত এই বছরের পর আমার আর সাক্ষাৎ পাবে না, তুমি আমার কবর ও মসজিদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে। তখন মুআয রাযিয়াল্লা-হু আনহু আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বিচ্ছেদের বিরহে অঝোরে কান্না করতে থাকেন।[৪]

তাঁদের বিরহের বেদনা পার্থিব জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং পরকালের বিরহও তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে আহত করত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আল্লাহর

---

* প্রভাষক (আরবি), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩; মিশকাত, হা/৭।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৩২।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩৮৫৬।

৪. ইবনু হিব্বান, হা/৬৪৭; হাদীছটিকে আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ ছহীহ বলেছেন; আত-তা'লীকাতুল হিসান, হা/৬৪৬।

রাসূল ﷺ-কে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট আমার জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয়, আপনি আমার নিকট আমার সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয়। যখন আমি বাসায় অবস্থান করি তখন আপনার কথা স্মরণ হলে আপনাকে না দেখা পর্যন্ত বাসায় থাকতে পারি না। আর যখন আপনার ও আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি, তখন দেখি আপনি নবীদের সাথে জান্নাতের উঁচু স্থানে থাকবেন আর জান্নাতের নিম্ন স্তরে আমার থাকার সুযোগ হলে আপনাকে দেখতে না পাওয়ার বেদনা আমাকে অস্থির করে তুলে! আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনো উত্তর দিলেন না। এমতাবস্থায় আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ বলেন, ‘যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে তারা ওই সকল নবী, পরম সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে থাকবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর বন্ধু হিসেবে তাঁরা কতইনা উত্তম’ *(আন-নিসা, ৪/৬৯)*।[৫]

তাঁরা সকলের উপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিতেন। কারণ রাসূল ﷺ-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁরা নিজেদের হৃদয়ে লালন করতেন। তাঁরা নিজেদের পরিবার, সন্তান ও জীবনের উপর তাঁকে প্রাধান্য দিতেন, যার নির্দেশ আল্লাহ তা‘আলা সকল মুসলিমকে দিয়েছেন। মহানবী ﷺ-এর প্রতি ছাহাবীদের ভলোবাসার চিত্র এমন ছিল যে, তাঁরা তাঁর ভালোবাসা পাওয়ার আশায় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। তাঁর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য সর্বদা তাঁরা উদগ্রীব থাকতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই অন্যের চাইতে তাঁর বেশি ভালোবাসা পাওয়ার চেষ্টা করতেন। এভাবেই তাঁর নির্ভেজাল ভালোবাসা ও গভীর মুহাব্বত লাভের জন্য তাঁদের চেষ্টা অব্যাহত থাকত।

রাসূল ﷺ-এর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা এত গভীর ছিল যে, তাঁরা তাঁর পবিত্র শরীরে চুম্বন দিতেন। একদিন যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ ছালাতের কাতার সোজা করছিলেন, তখন তিনি সাওয়াদ ইবনু গযিইয়ার পেটে লাঠি দিয়ে স্পর্শ করেন। সাওয়াদ এটিকে (রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা লাভের) একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আমাকে ব্যাথা দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল তাঁর পেট থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, হে সাওয়াদ! প্রতিশোধ নাও। সাওয়াদ দ্রুত আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পেটে নিজের পেট লাগিয়ে নিলেন এবং তাঁর পেটে চুমু খেলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আপনার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার এটাই চূড়ান্ত মুহূর্ত। তাই আমি আমার শরীর আপনার শরীরের সাথে মিলিয়ে নিচ্ছি। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দু‘আ করেন।[৬]

রাসূল ﷺ-এর প্রতি তাঁদের সত্য ভালোবাসার নিদর্শন এমন ছিল যে, তাঁর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যে কোনো শাস্তিকে সানন্দে মাথা পেতে নিতেন। তিনি সাময়িক কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তাঁদের আনন্দ ও শান্তির চিন্তা মন থেকে উধাও হয়ে যেত। তাঁর শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাঁরা জীবন উৎসর্গের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। যার দৃষ্টান্ত যায়েদ ইবনু দাছেনার ঘটনা। যখন ছফওয়ান ইবনু উমাইয়া, তার পিতা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁকে কিনে নিয়েছিল। হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁকে মাসজিদে হারামের সীমানা থেকে বের করে কৃতদাস নিসতাসকে দিয়ে তানঈম নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে কুরাইশদের একদল লোক উপস্থিত হয়েছিল যার মধ্যে আবূ সুফয়ানও ছিলেন। হত্যার উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে যাত্রা করলে আবূ সুফয়ান বললেন, ‘হে যায়েদ! আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি কি চাও যে, মুহাম্মাদ এখন আমাদের নিকট তোমার জায়গায় আসুক, আমরা তাকে হত্যা করব আর তুমি তোমার পরিবারের নিকট চলে যাবে?’ তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ ﷺ এখন যদি নিজ বাসায় অবস্থান করেন এবং কাঁটার আঘাতে সামান্য আহত হন আর আমি বাসায় বসে থাকি; এমনটাও আমি চাই না!’ তখন আবূ সুফয়ান বললেন, ‘আমি মানুষের মধ্যে এমন কাউকে দেখিনি, যিনি কাউকে এমন ভালোবাসে যেমন মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারীরা মুহাম্মাদ ﷺ-কে ভালোবাসে’। অতঃপর নিসতাস তাঁকে হত্যা করে![৭]

রাসূল ﷺ-এর প্রতি ছাহাবীদের ভালোবাসার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো তাঁরা তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে কখনই পিছপা হননি। তাঁর যে কোনো আদেশ তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন করতেন, তাঁর যে কোনো নিষেধাজ্ঞা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করতেন। এটি তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহা একদিন এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট আসলেন, যখন তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেন ‘তোমরা বসো’ ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানেই মসজিদের বাইরে খুৎবা শেষ হওয়া অবধি বসে রইলেন। তাঁর এই ঘটনা রাসূল ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাঁর জন্য এই বলে দু‘আ করেন, ‘মহান আল্লাহ তোমার মধ্যে আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ-এর অনুগত হওয়ার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন’।[৮]

একজন মুমিন ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়। সত্যিকারের ভালোবাসা ও প্রিয়জনের জন্য মানুষ তাই ভালোবাসে এবং ঘৃণা করে যা সে নিজের জন্য করে থাকে। যদি এই ভালোবাসা আন্তরিক হয়, তবে এই ভালোবাসা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হবে। রাসূল ﷺ-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা অর্জনের জন্য আমাদের সকলকে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৫. আল-মু‘জাম আত্ব-ত্বাবারানী আছ-ছাগীর, হা/৫২; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭/১০।
৬. সিলসিলা ছাহীহা, ৬/৮০৮, হা/২৮৩৫।
৭. আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ৩/৬৬৯।
৮. বায়হাক্বী, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ৬/২৫৭।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

*মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী**

*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী***

(পর্ব-৪)

আমরা যদি চুপ থাকি অথবা আমাদের যদি চুপ রাখা হয়, তাহলে আমাদের অবস্থা ঐ উটপাখির চেয়ে খারাপ হবে, যে নিজের মাথা মাটিতে ঢুকিয়ে দেয় এই ভেবে যে, তার লজ্জাস্থান আবৃত হয়ে গেছে অথবা শিকারিরা তাকে দেখতে পাচ্ছে না!!

আর যদি মুখ খুলি, তাহলে বলা হতে পারে, শত্রুরা তো সেই মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিল, যখন মুসলিমরা একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে কথা বলবে!! তাহলে করণীয় কী?! (আমার মনে হয়) মুসলিমদের পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে কথা বলার ইস্যুতে আল্লাহর শত্রুদের অপেক্ষার চেয়ে মুসলিমদের মতভেদ ও বিভক্তিতে তাদের খুশি অনেক বেশি মারাত্মক। কারণ মতভেদ ও বিভেদ দৃশ্যমান একটি বিষয়, যার মন্দ ফলাফলও নিশ্চিত। কিন্তু কারো কথা তো দ্রুতই শেষ হয়ে যায়।

'আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে, অনেক ভাই আছেন- যাদেরকে দ্বীনী স্বার্থবিষয়ক ঈর্ষা উদ্দীপনা যোগায়, দ্বীনী কর্মকাণ্ডের প্রতি একনিষ্ঠতা উৎসাহিত করে, কিন্তু তারা মনে করেন না যে, দলীয় কার্যক্রমের সমালোচনা ও পারস্পরিক নছীহত খোলাখুলি হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো, এতে দ্বীনী কাজে দোষ-ত্রুটি, ভুলভ্রান্তি ও ব্যর্থতা শত্রুর সামনে ধরা পড়বে। ফলে সে এই ছিদ্র দিয়ে গোপনে অনুপ্রবেশ করবে এবং জোরালোভাবে এসব কার্যক্রম ধ্বংসে আত্মনিয়োগ করবে। ফলে যে সময় এমনিতেই শত্রুর রূঢ়তা ও সীমালঙ্ঘন আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে সময় এটাকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না। তাহলে দ্বীনী কার্যক্রম ধ্বংসের আশঙ্কাও রয়ে যায়।... কিন্তু তাদের ব্রেনে আসলে দুটো বিষয় একাকার হয়ে গেছে, একটা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তিবিশেষের ভুল সংশোধনের পদ্ধতি, যা যথানিয়মেই হওয়া উচিত। অন্যথা তা একপ্রকার কুৎসা রটনায় পরিণত হয়। আরেকটা হচ্ছে, বিভিন্ন দলের ভুল সংশোধনের পদ্ধতি, যা প্রকাশ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যাতে সবার কাছে তা পৌঁছে যায় এবং সবাই দেখতে পায়।

আমরা এসব ভাইকে স্পষ্ট বলতে চাই, শত্রুরা যারা আমাদের ক্ষতি করতে চায়, তারা আমাদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে আমাদের চেয়েও বেশি জানে। কেননা তারা আজও সেই ছিদ্র দিয়েই অনুপ্রবেশ করছে, এর মাধ্যমেই তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং এটাকে জিইয়ে রাখার জন্য মরণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেসব ছিদ্র পর্যবেক্ষণে আমাদের অক্ষমতা এবং সেগুলো সমাধানে আমাদের ভয়ের কথাও শত্রুরা ভালোভাবেই জানে।

আমরা যে ব্যাপারে কথা বলছি, বাস্তবতাই তার প্রমাণ। আসলেই ইসলামের শত্রুরা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ব্যর্থতা সম্পর্কে ভালো জানে। যারা সেগুলো সম্পর্কে জানে না বা স্বীকার করতে চায় না, তারা কেবল আমরাই। কারণ আমরা এগুলোর উপর অটল। আমরা এগুলোর সমাধান ও এগুলো টপকে যেতে অক্ষম'।[১]

* বইটির লেখক আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আব্দুল হামীদ আল-হালাবী আল-আছারী (জন্ম : ১৩৮০ হিজরী) একজন ফিলিস্তীনী সালাফী আলেম। তিনি আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শায়খ আলবানী, শায়খ ইবনে বায, শায়খ বাকর আবূ যায়েদ, শায়খ মুক্ববিল ইবনে হাদী, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম শায়খ আলী আল-হালাবীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি একাধারে প্রসিদ্ধ আলোচক এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা।

** বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. মুহাম্মাদ উবাইদ হাসানা, নাযারত ফী মাসীরতিল আমালিল ইসলামী, পৃ. ৪৫।

মুসলিমরা যেসব ব্যাপারে তাদের চোখ বন্ধ করে রেখেছে, সেগুলোর মধ্যে এই ঘৃণিত বিভেদ, তাদের দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া, তাদের চলার পথ বিভিন্ন হওয়া সবচেয়ে মারাত্মক।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিমদের একতা ও হৃদ্যতা এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র চাবি— 'যদি তারা বুঝত' *(আত-তাওবাহ, ৯/৮১)*। কারণ 'মুসলিমদের একটি ত্বরীক্বায় আনাই হচ্ছে আসল ইসলাম'।[২]

এসব দল ও আন্দোলনের ব্যাপারে মোদ্দাকথা হচ্ছে, এদের ক্ষেত্রে দুটি অভিমত ঘুরপাক খায় :

(১) 'হয় তারা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একটি ব্যাপক জনমত গড়ে তুলছে, বিশাল গণজাগরণ[৩] তৈরি করছে, আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করছে, ইলম অনুযায়ী নছীহত করছে এবং ঔপনিবেশিকের ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করছে'।[৪]

(২) অন্যথা 'সেগুলো ঐক্য নষ্ট করছে, বিভেদ সৃষ্টি করছে, শারঈ জ্ঞানের ব্যাপারটা দুর্বল করে ফেলছে, ঐক্যের নামে ছাতার তলে বিদআতীদের লুকিয়ে রাখছে এবং প্রত্যেক দল তার সদস্য ও অন্যদের মাঝে গীবত ও নিজেদের পিপাসা নিবারণের পথ তৈরি করেছে'।[৫]

উভয় অভিমতের উপর ভিত্তি করে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এসব দল যত কল্যাণই উপহার দিক না কেন, সেগুলো এমন কিছু বীজ উৎপাদন করেছে, মুসলিম উম্মাহর ভাঙন ও ব্যাপকভিত্তিক ঐক্য বিনষ্টে যার ভূমিকা রয়েছে।

'মুসলিম উম্মাহর শত্রুরা ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এই ব্যাপক ঐক্য, শামেল মানহাজ, উম্মাহর হৃদ্যতা এবং আক্বীদা, মানহাজ ও আমলে তাদের সঙ্ঘবদ্ধতাই তাদের সম্মান, শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মূল কারণ। সেজন্য তারা এটাকে তছনছ করার কাজ করেছে। প্রথমে তারা নবুঅতী খেলাফত ধ্বংসের কাজ করেছে এবং এই ধারাকে সাধারণ শাসনতান্ত্রিক ধারায় রূপান্তরিত করেছে। তারপর আঞ্চলিক, অতঃপর গোত্রভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক ধারায় রূপান্তরিত করেছে। এর পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করার সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে দেশ, ভাষা, জাতীয়তা, মাযহাব, এমনকি মানুষের শখ, বিশ্বাস ও ঝোঁকের উপরও দলীয় মনোভাব ছড়িয়ে দিয়েছে।

দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ এই ধ্বংসপরিকল্পনার কাছে দ্রুত আত্মসমর্পণ করেছে। মুসলিম উম্মাহ যেন কাচ বা পোড়ামাটির তৈরি বল ছিল; তারা ইস্পাত বা আগুনের তৈরি বল ছিল না।

আরো দুঃখজনক হচ্ছে, যারা বিভক্তি ও মতভেদের যুগে বেড়ে উঠেছে, তাদের কাছে বিভক্তিই দ্বীনধর্মে পরিণত হয়েছে। কারণ বিভক্তি উত্তরাধিকার সত্বের আওতাভুক্ত হয়ে গেছে। বরং তাদের কাছে দ্বীনটাই হয়ে গেছে বিভক্তি। কেননা তারা দ্বীনকে দেশ, সম্প্রদায়, মাযহাব, শায়খ-মাশায়েখ ও বিভিন্ন দলে ভাগ করে ফেলেছে।

---

২. মুহাম্মাদ রশীদ রেযা, আল-ওয়াহদাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৯।

৩. অনেক শুনি বা পড়ি, 'নতুন এই ইসলামী জাগরণ ইসলামী দলগুলোর অবদান' *(আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, মা'শরূ'ইয়্যাতুল 'আমাল আল-জামা'ঈ, পৃ. ২৭-২৮)*। এর জবাবে আমরা বলতে চাই, এই জাগরণ 'শুরু হয়েছিল জামালুদ্দীন আফগানীর ডাকের মাধ্যমে। তারপর তা মুহাম্মাদ আব্দুহু-এর হাত ধরে উন্নতি সাধন করে। তারপর রশীদ রেযার হাত ধরে তার 'আল-মানার' পত্রিকার মাধ্যমে প্রসার লাভ করে। যা অবিচ্ছিন্নভাবে পুরো ৩০ বছর মুসলিমচেতনায় ইছলাহী চিন্তাধারার খোরাক যোগায়। তারপর এই তৎপরতা সালাফী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রসার লাভ করে: বাদীস, মালেক ইবনে নাবী... তারপর সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে প্রসার লাভ করে: আল-বান্না, নাবহানী... এমনি করে ধারাবাহিকভাবে এই তৎপরতা বাড়তে থাকে ও বড় হতে থাকে, যা এখন নিয়ন্ত্রণ ও সীমায়িত করা কঠিন। কারণ তা এখন সাধারণ জনগণের জাগরণের বাহ্যিক নিদর্শনে পরিণত হয়েছে; কোনো সংগঠন, দল ও দৃষ্টিভঙ্গির চেয়েও তা বড় হয়ে গেছে' *(আন-নাক্বদুয যাতী, পৃ. ২৮)*।

আসলে 'বাস্তবতা হচ্ছে, শেষের দুই দশকে বিভিন্ন জামাআতের আন্দোলন মূলত ইসলামী জাগরণের অবদান' *(শায়খ সা'দ আল-হুছাইন কর্তৃক লেখকের কাছে প্রেরিত পত্র, নম্বর: ১৩৬)*, এর বিপরীতটা নয়।

ইসলামী আন্দোলনের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে জানতে দেখুন: শায়খ বাকর আবু যায়েয, মু'জামুল মানাহী আল-লাফযিয়্যাহ, পৃ. ২০৯।

৪. আয়েয আল-ক্বরনী, আল-হারাকাতুল ইসলামিয়্যাহ আল-মু'আছেরাহ, পৃ. ১০।

৫. আয়েয আল-ক্বরনী, আল-হারাকাতুল ইসলামিয়্যাহ আল-মু'আছেরাহ, পৃ. ১০।

তারপর এসেছে আগের চেয়েও ভয়ানক তিক্ততা। কারণ দ্বীনের লক্ষ্য অর্জন ও মুসলিমস্বার্থ চরিতার্থে খোদ ইসলামের দিকে দাওয়াতই এখন বিভক্তি ও বিভেদের মানহাজ অনুসরণ করতে শুরু করেছে।

অথচ একথা নিশ্চিত জানা যে, বৃহৎ ঐক্য ও ব্যাপক ভ্রাতৃত্ব ছাড়া দ্বীনের বড় বড় লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়'।[৬]

প্রশ্ন হচ্ছে, দলাদলি কি সেই বৃহৎ ঐক্যের সাথে যায়?! বিভক্তি কি এই ব্যাপকভিত্তিক ভ্রাতৃত্বের সাথে মিশে?! এই যুগে 'ইসলামী আন্দোলন'[৭] কি বিভিন্ন দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে যে, প্রত্যেকটা দল নিজের জন্য ইসলামী আন্দোলনের ধ্বজাধারী হওয়ার দাবী করছে?! কঠিন বাস্তবতা কি আমাদের জন্য শরীআতের বিরোধিতা করার অনুমতি দিয়েছে?! আমরা আসলে কোন লক্ষ্যপানে ছুটে চলেছি? কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে শরীআতসম্মত উপায় আসলে কী? লক্ষ্য এবং মাধ্যম আমাদের কাছে কেন একাকার হয়ে যাচ্ছে?! লক্ষ্য এবং কর্ম কেন বিপরীতমুখী হচ্ছে?! কীভাবে আমরা বিভিন্ন বিষয়কে পরিমাপ করব?! কীভাবে আমরা শরীআতের হুকুম অবগত হব?! কীভাবে আমরা ভালো-মন্দের মধ্যে তুলনা করব?! কীভাবেই-বা কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যে আমরা তুলনা করব?!

মুমিন যুবকের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূর করার উদ্দেশ্যে কুরআন, সুন্নাহ ও উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে আমরা এসব প্রশ্ন ও সমস্যাগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, 'ইসলামী দল ও সংগঠনগুলোর ইজতেহাদ সমালোচনা ও সংশোধনের বাইরে নয়'।[৮] আর এ উদ্দেশ্যেই আমরা দল ও দলীয় লোকজনের সমালোচনা করছি। সুতরাং কারো বুক যেন সংকীর্ণ না হয়ে যায় এবং ধারণার আগুনে পুড়ে দগ্ধীভূত না হয়।

আমরা একথাও নিশ্চিত জানি, দলাদলি ও দলবাজিদের[৯] বিরুদ্ধে কথা বলা মানে এই নয় যে, 'হক্ব কথা বলার জন্য বা কোনো যালেমকে প্রতিহত করার জন্য বা কোনো অভাবীকে সাহায্য করার জন্য অথবা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে শত্রুতা-সীমালঙ্ঘন প্রতিহত করার জন্য একজন মুসলিমের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারো সাথে মেশা জায়েয নয়'[১০]- যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে থাকে। তাদের এ ধারণা একেবারে অবান্তর।

বরং পারস্পরিক শরীআতসম্মত সহযোগিতা ও একাগ্র দ্বীনী কর্মকাণ্ডের দরজা খোলা রয়েছে তাদের জন্য, যারা একাজের যোগ্য এবং তা অবশ্যই হতে হবে শরীআতের নিয়মনীতির আলোকে। 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শরীআতের ধারক-বাহক সম্প্রদায় থেকে কোনো যুগকেই খালি রাখেন না, যারা অপবাদ আরোপকারীদের দাঁতভাঙা জবাব দেন এবং বিভ্রান্তদের বিভ্রান্তির মুখোশ উন্মোচন করেন'।[১১]

আল্লাহর ইচ্ছায় নছীহত শোনার জন্য বা গঠনমূলক সমালোচনা পাওয়ার জন্য হৃদয়টা খোলা রয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য।

বিনীত

আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আব্দুল হামীদ আল-হালাবী আল-আছারী।

(চলবে)

৬. সম্পাদকীয়, মাজাল্লাতুল ফুরকান আল-কুয়েতিয়্যাহ, সংখ্যা: ৪, পৃ. ৪-৫।

৭. এখানে একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে চাই, 'ইসলামী আন্দোলন' পরিভাষাটি কোনো দলের দলীয় কার্ড নয় যে, তা বিলি করা হবে। বরং যারই ইসলামের ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে এবং এক্ষেত্রে শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে, সে-ই 'ইসলামী আন্দোলন'-এর সদস্য— সে কোনো সংগঠনের ভেতরে থাক বা না থাক। কিন্তু অবস্থা যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে সে 'ইসলামী আন্দোলন'-এর সদস্য হতে পারে না— যদিও সে দলীয় কার্ড বহন করুক না কেন। খালেছ জালাবী প্রণীত 'আন-নাক্বদুয যাতী' কিতাবের ২২৮ পৃষ্ঠায় এসেছে, এটা এমন একটা পরিভাষা, যাকে নিষিদ্ধ শব্দসমূহের (المناهي اللفظية) তালিকায় যুক্ত করা উচিত।

৮. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, মাফহূমুন নাক্বদিয যাতী, মাজাল্লাতুল ফুরকান আল-কুয়েতিয়্যাহ, সংখ্যা: ১৫, পৃ. ৭।

৯. হাসান আল-বান্না, মাজমূ'আতুর রসায়েল, পৃ. ১৪৬।

১০. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, মাফহূমুন নাক্বদিয যাতী, মাজাল্লাতুল ফুরকান আল-কুয়েতিয়্যাহ, সংখ্যা: ১৭, পৃ. ২৬।

১১. আল-মুনতাক্বা আন-নাফীস মিন তালবীসি ইবলীস, পৃ. ৪৪৫।

সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া

-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী*

(মার্চ'২২ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৭)

(৭) শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا - وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا -وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا - إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا - لِلطَّاغِينَ مَآبًا - لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا - لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا - إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا - جَزَاءً وِفَاقًا - إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا - وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا﴾ 'যেদিন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন তোমরা দলে দলে আসবে। আকাশ খুলে দেওয়া হবে ফলে তা বহু দরজাবিশিষ্ট হয়ে যাবে এবং পাহাড়সমূহকে চলমান করা হবে, ফলে সেগুলো মরীচিকায় পরিণত হবে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওত পেতে আছে, যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া সেখানে তারা না কোনো ঠান্ডা (বস্তুর) স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে আর না কোনো পানীয়ও পানের সুযোগ পাবে। এটাই (তাদের) উপযুক্ত প্রতিফল। নিশ্চয় তারা কখনোই হিসাব-নিকাশের আশা করত না এবং দৃঢ়তার সাথে আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো' *(আন-নাবা, ৭৮/১৮-২৮)*। মহান আল্লাহ বলেন, - ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ - قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ 'সেদিন প্রকম্পকারী প্রকম্পিত করবে, তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী প্রকম্পন। অনেক হৃদয় সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে' *(আন-নাযিয়াত, ৭৯/৬-৮)*।

আল্লাহ তাআলার আদেশে ইসরাফীল (আলাইহিস সালাম) (ফেরেশতা) শিঙায় দুই বার ফুৎকার দিবেন, যা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠিন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ 'আর শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অবস্থান করতে তারা সবাই অজ্ঞান হয়ে যাবে; তবে তারা ব্যতীত যাদের অজ্ঞান হওয়া আল্লাহ চাইবেন না। অতঃপর আবার শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সাথে সাথে তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে' *(আয-যুমার, ৬২/৬৮)*। দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার জন্য এক ফুৎকার আর কবর থেকে উঠার জন্য আরেকটি ফুৎকার দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখনই তারা কবর হতে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠালো? এ হলো তা-ই দয়াময় আল্লাহ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন। এটা এক বিকট আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয়; তখনই তাদের সকলকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। আজ কারো প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে শুধু তারই প্রতিফল দেওয়া হবে *(ইয়াসিন, ৩৬/৫১-৫৪)*।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী মদীনার বাজারে উচ্চৈঃস্বরে বলল, না (এমনটা হবে না), সেই সৃষ্টিকর্তার শপথ! যিনি মূসা (আলাইহিস সালাম) -কে মানবজাতির উপর মর্যাদা দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'এক আনছারী লোক একথা শুনার সাথে সাথে হাত তুলে ইয়াহূদীর মুখে চড় মেরে দিলেন। তিনি বললেন, তুমি এই কথা বলছ, অথচ আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন? (উভয়ে মহানবীর নিকট উপস্থিত হলে) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আর যখন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ তাআলা যাকে জীবিত রাখতে চান সে ব্যতীত আসমান-যমীনের সকলে মূর্ছায় যাবে। তারপর আবার শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে। সহসা তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে' *(আয-যুমার, ৪৩/৬৮)*। 'আমিই সবার আগে মাথা তুলে দেখব যে, মূসা (আলাইহিস সালাম) আরশের পায়াসমূহের একটি ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনি আমার আগে মাথা তুলেছেন নাকি। তিনি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ তাআলা (জ্ঞানশূন্য হওয়া থেকে) মুক্ত রেখেছেন। আর যে লোক বলে যে, আমি ইউনুস ইবনু মাত্তা (আলাইহিস সালাম) -এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে মিথ্যা বলে'।[১]

নবী রাসূলগণ সবাই আল্লাহর বান্দা। আমরা তাদের সবাইকে সম্মান করি। তাদের কারো মাঝে কোনো পার্থক্য করি না এবং কোনো নবী-রাসূলকে খাটো করি না। আর আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল যা সকলেরই জানা। কিন্তু এ নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করি না।[২] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুইন বলল, 'হে আল্লাহ রাসূল! শিঙা কী? তিনি বললেন, 'তা হলো একটি শিং বা বাঁশি, যাতে ফুৎকার দেওয়া হবে'।[৩] আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যিনি শিঙায় ফুৎকার দিবেন, তিনি শিঙা মুখে নিয়ে মাথা নুইয়ে কান খাড়া করে অপেক্ষমান আছেন, শিঙায় ফুৎকার দেওয়ার আদেশ পাওয়া

* পি.এইচ.ডি গবেষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া।

১. তিরমিযী, হা/৩২৪৫, হাসান ছহীহ।

২. শারহে আক্বীদা আত্ব-ত্বহাবিয়া, পৃ. ৭৬-৭৯।

৩. সিলসিসা ছহীহা, হা/১০৮০; তিরমিযী, হা/৩২৪৪।

মাত্রই তিনি ফুৎকার দিবেন। এ অবস্থায় আমি কীভাবে নিশ্চিন্তে আরামে বসে থাকতে পারি?' ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কীভাবে দু'আ করব? তিনি বললেন, 'তোমরা বলো, "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল, তাওয়াক্কালনা আলাল্লাহি রাব্বিনা" অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি আমাদের অতি উত্তম অভিভাবক, আমরা আমাদের রব আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করি'।[৪] আল্লাহর নিকট আমরা প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের ঈমানকে মযবূত করেন।

(৮) তাক্বদীর : তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের ৬টি রুকনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন; তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস না করলে ঈমান থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর সবকিছুই আমরা সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে' *(আন-নাবা, ৭৮/২৯)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমরা সবকিছু নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি' *(আল-ক্বামার, ৫৪/৪৯)*। আর তাক্বদীরের ৪টি স্তর রয়েছে যেগুলোর উপর ঈমান আনা আবশ্যক। সেগুলো হলো—

(ক) আল্লাহর জ্ঞান : সকল কিছুই মহান আল্লাহ জানেন। ভালো-মন্দ, আগের-পরের, গোপন-প্রকাশ্য সবই তার জানা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ 'গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তারই নিকট রয়েছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না' *(আল-আনআম, ৬/৫৯)*।

(খ) আল্লাহর লিখে রাখা : মহান আল্লাহ সকল কিছু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মানবজীবনে যা কিছু হচ্ছে সবকিছুই লিপিবদ্ধ আছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ 'তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহর অবগতিতে রয়েছে? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; অবশ্যই এটা আল্লাহর নিকট অতি সহজ' *(আল-হজ্জ, ২২/৭০)*।

(গ) আল্লাহর ইচ্ছা : আল্লাহ তাআলা মানুষকে ভালো-মন্দ বুঝার জ্ঞান দান করেছেন। তাই তারা বুঝে শুনে কাজকর্ম করবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ 'আর তোমরা যা ইচ্ছা তা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা পোষণ করেন' *(আত-তাকভীর, ৮১/২৯)*। এটার অর্থ এই নয় যে, মানুষের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নেই। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে তবে আল্লাহ ইচ্ছা না করলে সে তার নিজের ইচ্ছায় কোনো কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ মানুষকে ভালো-মন্দ বুঝার তাওফীক্ব দান করেছেন। সে ভালো কাজ করার চেষ্টা করবে আর অন্যায়-অপকর্ম থেকে নিজেকে সর্বদা বিরত রাখার চেষ্টা করবে।

(ঘ) আল্লাহর সৃষ্টি : মহান আল্লাহ সকলের স্রষ্টা। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ 'আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক' *(আয-যুমার, ৩৯/৬২)*। আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু একমাত্র তিনিই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানবজাতির উচিত হবে যে, আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি, তাঁর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি, আখেরাত বা পরকালের প্রতি, তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা।[৫] মানুষের উচিত যেটা তার জন্য কল্যাণকর সেই কাজটা করা, আর যেটা তার জন্য ক্ষতিকর তা থেকে বিরত থাকা।

(৯) জাহান্নাম : আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য এবং তাঁর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা ও শিরক থেকে দূরে থাকার জন্য। এছাড়াও তার আরো দায়িত্ব হলো, বিদআত পরিত্যাগ করা, সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা, হালাল গ্রহণ, হারাম বর্জন করা, সূদ-ঘুষ পরিত্যাগ করা, হালাল ব্যবসা করা, যেনা-ব্যভিচার ত্যাগ করা, যেনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিবাহ করা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা, আমানতের খেয়ানত না করা, একে অপরের কল্যাণ কামনা করা, মানুষের প্রতি যুলুম না করা, হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা, মুসলিমগণ পরস্পরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করা, কারো মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ না করা, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা না করা, সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি না করা, জান্নাত লাভের কাজ করা, জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয় এমন কাজ থেকে দূরে থাকা। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওত পেতে রয়েছে, যা সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে। ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত সেখানে তারা কোনো শীতল বস্তুর স্বাদ বা কোনো পানীয়ও পান করতে পাবেনা। এটাই উপযুক্ত প্রতিফল' *(আন-নাবা, ৭৮/২১-২৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ 'নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে এবং যারা শিরক করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট' *(আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮/৬)*।

মুসলিম ব্যতীত অন্য যত ধর্মের অনুসারী আছে যেমন— ইয়াহূদী, নাছারা, বৌদ্ধ, অগ্নিপূজক, হিন্দু ইত্যাদি তাদের জন্য জান্নাত হারাম এবং যারা মুশরেক এদেরকেও মহান আল্লাহ জাহান্নামে দিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর কিছু সম্প্রদায় আছে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে, যেমন

৪. সিলসিলা ছহীহা, হা/১০৭৮, ১০৭৯; তিরমিযী, হা/৩২৪৩।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৮।

ক্বাদিয়ানী, কিন্তু তারা রাসূল ﷺ-কে শেষ নবী হিসাবে মানে না। এরা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার যারা কুরআনে ত্রুটি আছে বলে মনে করে অথবা যারা নিজেদেরকে নিষ্পাপ মনে করে অথবা যারা হালালকে হারাম মনে করে এবং হারামকে হালাল মনে করে অথবা আল্লাহকে অস্বীকার করে এরাও মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এসকল মানুষরাই নিকৃষ্ট। আর এরাই হলো পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ ‘আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় রয়েছে কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখে না, তাদের কর্ণ রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না, তারাই হলো পশুর ন্যায় বরং তার অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট; তারাই হলো গাফেল বা অমনোযোগী’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৭৯)*। মহান আল্লাহ বলেন, ‘কাফেরদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের দারোয়ানরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্যে হতে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন এবং তোমাদেরকে এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করতেন? তারা বলবে, অবশ্যই এসেছিল, প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুম বাস্তবায়িত হয়েছে। তাদেরকে বলা হবে জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ করো, তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। অহংকারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট’ *(আয-যুমার, ৩৯/৭১-৭২)*। মহান আল্লাহ বলেন, ‘অথবা শাস্তি দেখতে পেলে যেন কাউকেও বলতে না হয়, হায়! যদি একবার আমি ফিরে যেতে পারতাম তবে আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। হ্যাঁ, অবশ্যই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোতে মিথ্যারোপ করেছিলে এবং অহংকার করেছিলে; আর তুমি ছিলে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, আপনি কিয়ামতের দিন তাদের চেহারাসমূহ কালো দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? *(আয-যুমার, ৩৯/৫৮-৬০)*।

হে কবরপূজারী! হে ধর্মত্যাগী মুরতাদ! হে ইয়াহূদী! হে নাছারা! হে হিন্দু! হে কাফের! হে মুশরেক! ইসলামের ছায়াতলে চলে এসো, নইলে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সেদিন আফসোস করে কোনো লাভ হবে না। সময় থাকতেই ইসলামের পথে ফিরে এসো।

আমরা জানি জান্নাত-জাহান্নাম সত্য। জান্নাত পরম সুখের স্থান এবং জাহান্নাম কঠিন শাস্তির। তবে কারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে? আর কারা কিছুদিন শাস্তি ভোগের পর মুক্তি পাবে? যারা বড় কুফরী বা বড় শিরক বা এর সমপর্যায়ের কোনো পাপ করে তওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করবে, তারা কবরে শাস্তি পাবে এবং স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ‘সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং যে দিন কিয়ামত ঘটবে সে দিন (বলা হবে) ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিনতর শাস্তিতে নিক্ষেপ করো’ *(আল-মুমিন, ৪০/৪৬)*। পক্ষান্তরে যারা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু পাপ করে মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের পাপ পরিমাণ শাস্তি দিয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তি না দিয়ে এমনিতেই ক্ষমা করে দিবেন।[৬]

মোটকথা, মুসলিম ব্যক্তি যদি পাপীও হয় আর ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। বরং বড় পাপীরাও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সুপারিশ পেয়ে জাহান্নাম থেকে বের হবে। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, شَفَاعَتِى لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى ‘আমার উম্মতের কবীরা গুনাহগারদের জন্যও আমার শাফাআত রয়েছে’।[৭] তবে উল্লেখ্য যে, কেউ যদি তওবা ছাড়াই বড় শিরক করে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার জন্য জান্নাত হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ ‘নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন, তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী হবে না’ *(আল-মায়েদা, ৫/৭২)*। ঐ সমস্ত পীরদের জন্য ধ্বংস! যারা কবরকেন্দ্রিক ব্যবসা করছে, যাদের নিকট মানুষ সন্তান প্রার্থনা করছে, যাদের নিকট শাফাআত ও নাজাতের প্রার্থনা করছে, যাদের কারণে মানুষ কবরকে সিজদা করছে, নযর মানছে, দু‘আ প্রার্থনা করছে, গরু-খাসি যবেহ করছে তাদের উচিৎ আল্লাহ ও পরকালের শাস্তিকে করা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করাকে ক্ষমা করবেন না এবং এতদ্ব্যতীত এর নিম্নপর্যায়ের গুনাহসমূহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে নিশ্চয় চরমভাবে গোমরাহ হয়ে গেল’ *(আন-নিসা, ৪/১১৬)*। আল্লাহ যেন আমাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করেন।

(চলবে)

---

৬. শারহে আক্বীদা আত্ব-ত্বহাবিয়্যা, পৃ. ২৬৪।

৭. আবূ দাঊদ, হা/৪৭৩৯, সনদ ছহীহ।

উপেক্ষিত ধর্ম, নির্বাসিত মূল্যবোধ

-ড. মো. কামরুজ্জামান*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আধুনিক যুগ একটি পরিবর্তনের যুগ। দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেছে সৌরজগতের এ ছোট পৃথিবীটি। আর যেটুকু আছে সেটুকুও ভবিষ্যতে ব্যাপক পরিবর্তন অপেক্ষা করছে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তারা হয়ে যাচ্ছে বড্ড অচেনা। ইতোমধ্যে দেশীয় বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অবকাঠামোগত নানা দিকেরও পরিবর্তন সাধিত হতে চলেছে। আর মানব-জীবনের সবচেয়ে বড় দিক হলো মানুষের নৈতিকতার পরিবর্তন। ন্যায় এবং অন্যায় বিভাজনে মানুষ এখন বড়ই দ্বিধান্বিত। সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলাটা এখন বড়ই দুষ্কর। দেশে কোনটি আলো আর কোনটি অন্ধকার সেটার পার্থক্য করাও বড় কষ্টকর। সততার আলো যেন মানুষের চক্ষুকে এখন ঝলসে দিচ্ছে। মানুষ যেন বুনো বাদুরে পরিণত হয়ে গেছে। পরিণত হয়ে পড়েছে তারা পেঁচায়। দিনের আলো যেন মানুষের এখন ভালো লাগে না। রাতের অন্ধকার তাদের বড়ই প্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ তারা দিনের চেয়ে রাতকেই বেশি ভালোবাসে। অসৎ মানুষেরা রাতটাকে এখন বাদুড়ের মতো আরামদায়ক করে নিয়েছে। আবহমান কাল থেকে বাংলার সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলোতে 'ঘুষ' নামে একটি অনৈতিক প্রথার প্রচলন ছিল। অনেকদিন ধরে এটাকে বাঙ্গালিরা ঘুষ বলেই জানত। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে এ শব্দটির নামও পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হয়ে এটার নাম এখন 'তদবির খরচ'। তথাকথিত শিক্ষিতজন কর্তৃক এটি একটি ননঅফিসিয়াল পরিভাষায় রূপান্তর লাভ করেছে। এটা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের মহা এক ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এটা মূল্যবোধের এক চরম অবক্ষয় হিসেবে সকল মহলে পরিচিত।

ছোটবেলায় এ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল নৈতিকতা অর্জনের কারখানা। আগেকার দিনে প্রাথমিকে শিশুদেরকে নানা নীতিবাক্য শেখানো হতো। 'সদা সত্য বলিবে, মিথ্যা বলিবে না। না বলিয়া পরের দ্রব্যে হাত দিবে না। না বলিয়া পরের দ্রব্যে হাত দেওয়াকে চুরি করা বলে। চুরি করা বড়

সেই শিক্ষাতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এসব নীতিবাক্যের জায়গায় 'আগডুম বাগডুমে'র আগমন ঘটেছে। ঘোড়াডুমের মতো অর্থহীন শিখন ও পঠন ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। কোমলমতি শিশুদেরকে নীতিহীন করেই আমরা বড় করে তুলছি। ছাড়া অন্য কিছু নয়। মূল্যবোধ জলাঞ্জলির বড় উদাহরণ এর চেয়ে আর কী-ই বা হতে পারে!

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হলো বিশ্ববিদ্যালয়। এটা একসময় উন্নত জ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেখানেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠেন। এটা মানবিক মূল্যবোধের ভয়ানক অবক্ষয়ই বলতে হবে। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত প্রাণপুরুষ কবি আল মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়কে তাই ডাকাতের গ্রাম বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন মেধার চর্চা হয় না বললেই চলে। এখানে এখন চর্চা হয় নীতিভ্রষ্ট রাজনীতির। এখানে ব্যাপকভাবে এখন নিয়োগ বাণিজ্যের চর্চা হয়। মেধার পরিবর্তে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেখানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তেলবাজি ও দলবাজিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে দলবাজির কাছে মূল্যবোধ পরাজিত হয়। স্কুল এবং কলেজগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। স্কুল-কলেজের কমিটিগুলোর বিরুদ্ধে অর্থবাণিজ্যের অভিযোগ এখন ওপেন সিক্রেট। এ সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে মেধাকে খুব কমই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। নির্লজ্জ দলবাজি আর অর্থই শিক্ষক হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর এ অবস্থা সারা দেশের স্কুল-কলেজে কম-বেশি চলমান রয়েছে। এতে করে বাচ্চাদের হাতেখড়ি হচ্ছে অনৈতিক শিক্ষকের কাছে। এর মাধ্যমে শিশুদের পড়ানোর জন্য আমরা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছি। শিক্ষক যখন দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ পান, এমতাবস্থায় তাদের কাছ থেকে নৈতিকতা আশা করা অর্থহীন। কারণ তাদের সামগ্রিক নিয়োগপ্রক্রিয়াটাই নৈতিকতা পরিপন্থি। সুতরাং তারা নিজেরাই মূল্যবোধ বিবর্জিত মানুষ। তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা বাতুলতার নামান্তর। এটি তেঁতুল

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

গাছ থেকে কলা পাবার আশা করার মতো অর্থহীন ব্যাপার। অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া ঐ শিক্ষকের দ্বারা যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাওয়া মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। তাইতো শিক্ষাঙ্গনে বারবার ঘটছে যৌন নিপীড়নের মতো ঘৃণ্য ঘটনা। কিন্তু ভুক্তভোগীরা এ ঘটনার কাঙ্ক্ষিত প্রতিকার পাচ্ছেন না। স্বাধীন দেশে আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত লজ্জার ও ঘৃণার। জাতি হিসেবে আমরা এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিচ্ছি না। অধিকন্তু এ সমস্ত শিক্ষকের সাথে সচেতন নাগরিকরাই একাট্টা হয়ে মিশে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির সাথে আপসকামী হিসেবে তৈরি হয়ে উঠছে। তারা দুনীর্তিকে আর দুর্নীতি মনে করছে না। অন্যায়কেও অন্যায় হিসেবে আর বিবেচনায় নিচ্ছে না। ফলে তাদের বিবেকবোধ অসুস্থ জরাজীর্ণে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তাদের সুকুমার প্রবৃত্তি নিস্তেজ হয়ে গেছে। ফলে তারা রাষ্ট্রের যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই সৃষ্টি করেছে হ-য-ব-র-ল অবস্থা। প্রাচীন বাংলায় কোনো না কোনো একজন শিক্ষক ছিলেন শিক্ষার্থীদের অনুকরণীয় আদর্শ। কিন্তু বিগত কয়েক যুগে সে জায়গাটিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বলতে গেলে শিক্ষার্থীদের কাছে কোনো শিক্ষকই এখন আর অনুকরণীয় মডেল নেই। নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা কিংবা কোনো খেলোয়াড় হয়ে গেছে তাদের অনুসরণীয় মডেল। যুবসমাজ থেকে মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব, সভ্যতা সবই প্রায় হারিয়ে গেছে।

এ সমস্ত শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে রাজনীতি হয়ে পড়েছে কলুষিত। রাজনীতি রাজ্য শাসনের সর্বোচ্চ নীতি হলেও সেটা এখন ক্ষমতা দখলের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। প্রবীনদের অনৈতিক চতুরতার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তৈরি হয়ে গেছে নবীন রাজনীতিবিদগণ। কিছু রাজনীতিকদের মন্দ শব্দচয়ন তাদের নীতিবোধকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আর মনুষ্যত্বকে করেছে কলুষিত। বলতে গেলে দেশের ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতি ক্রমান্বয়ে লুটপাটের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এটা এখন অবৈধ অর্থ সংগ্রহের মহোৎসবের মাধ্যম হিসেবে পরিণত হয়েছে।

বাঙালি সমাজের প্রতিটি পরিবার একসময় ছিল একটি বিদ্যালয় সমতুল্য। এই পরিবারই ছিল নৈতিকতা অর্জনের সূতিকাগার। এখন সেটা আর সে অবস্থায় নেই। এখন সেটারও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সেটা এখন প্রতিযোগিতার নিকেতনে পরিণত হয়েছে। আমাদের সন্তানদের শুধু দৌড়াতে শিখাচ্ছি। তাদেরকে আমরা বানাতে চাচ্ছি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার। বড় করতে চাচ্ছি টাকা উপার্জনকারী এক ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে। কিন্তু তাদেরকে আমরা ভালো মানুষ বানাতে চাচ্ছি না। বাচ্চারা এখন পড়াশুনা করছে শুধু A+ পাবার জন্য। তারা আনন্দের জন্য পড়ছে না; ভালো মানুষ হওয়ার জন্য পড়ছে না। তারা তোতাপাখির মতো কিছু বুলি মুখস্থ করছে। তারা পড়ছে শুধু টাকা অর্জনের জন্য। এটা নৈতিক অবক্ষয়ের মারাত্মক এক দিক। প্রাচীন বাংলায় পাত্রীকে পাত্রস্থ করতে মেয়ে এবং মেয়ের বাবা সৎ পাত্রের খোঁজ করত। পাত্র চরিত্রবান কি না সেটাকে অগ্রাধিকার দিত। কিন্তু বর্তমান সমাজের পাত্রী এবং পাত্রির পিতারা পাত্রের টাকাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অর্থাৎ একজন পাত্র সরকারি চাকরি করলেই হলো। সততা সেখানে গুরুত্বহীন। বাড়ি আছে কি না, পাত্রের জমিজমা আছে কি না ইত্যাদি বিষয় এখন প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সৎ, না অসৎ—সামাজিক জীবনে তার কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে না। তরুণ প্রজন্মও হাঁটছে সেদিকে। জোর কদমে এগিয়ে চলছে তারা অজানা গন্তব্যের দিকে। তারা চলছে ভোগবাদিতার দিকে। এটা জাতির জন্য এক মহা অশনিসংকেত। তরুণ প্রজন্ম পরিণত হয়েছে মানসিক দাসে। আর মানসিক লালসা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এটা একটি দেশ ও জাতির জন্য মারাত্মক বিপদ সংকেত।

সমাজের কতক লোক আবার সততার ছদ্মাবরণে আচ্ছাদিত। বাহ্যিকভাবে তারা ভালো মানুষের রূপ ধারণ করতে বেশ অভ্যস্ত। এ ক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় অবলম্বন ধর্মীয় লেবাস। এসব লেবাসধারিদের অন্তরটা শত জটিল, কুটিল আর নানা অসততায় পরিপূর্ণ। কোনো কারণে যে কোনো বিষয়ে তাদের সাথে মতের অমিল হলেই তাদের খোলস বেরিয়ে পড়ে। তাদের লেবাসের অন্তরালে জমানো ঘৃণ্য চরিত্র উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। তাদের অন্তরে লালিত আসল চেহারা মুখের ভাষায় প্রকাশ পেতে থাকে। লেবাসের আড়ালে মূলত তাদের অনৈতিকতা, অসাধুতা আর চরম নির্লজ্জতাই যাহির হয়ে পড়ে। সরকারি অফিসের অনেক ঘুষখোর আছেন যাদের মুখ দাঁড়িতে ভরা। পরনে থাকে তাদের ধর্মীয় পোশাক। আর মাথা থাকে টুপিতে ঢাকা। এই ঘুষের টাকা দিয়ে তিনি প্রতি বছর হজ্জে যান। এসব মন্দ লোকের বাহিরের আবরণটা বেশ চুপচাপ ও ভদ্রতায় ভরা।

কিন্তু তাদের ভিতরটা ভয়ংকর নেকড়ে মানসিকতায় ভরা। সুযোগ পেলেই তারা হিংস্র হয়ে ওঠে। এটাই হলো বর্তমান বাংলার বাস্তব সমাজচিত্র। এ চিত্র প্রতিদিনই মানুষের আত্মাকে একটু একটু করে কলুষিত করে চলেছে। অর্থ আর স্বার্থ ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। দেশের সামগ্রিক পরিবেশ মূল্যায়ন করে এভাবে বলা যায় যে, নৈতিকতার যদি কোনো কাঠামো ও অবয়ব থাকত, তাহলে এতদিনে তাকে গুম করা হতো কিংবা গভীর জঙ্গলে নির্বাসন দেওয়া হতো অথবা নদীতে ডুবিয়ে চিরতরের জন্য সলিল সমাধির ব্যবস্থা করা হতো। সুতরাং আমরা ঘোরময় মূল্যবোধশূন্য এক অন্ধকার অমানিশাতে বসবাস করছি।

দেশে টাকাওয়ালা লোকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। ধনীরা ক্রমশ ধনী হচ্ছে। তারা সম্পদের পাহাড় তৈরিতে ব্যস্ত। এক্ষেত্রে তাদের কাছে নৈতিকতার কোনো প্রয়োজন নেই। যে কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জনই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ধনীরা প্রচুর অর্থের মালিক হয়েও তারা মনে কোনো প্রশান্তি পাচ্ছে না। তারা একটু সুখ ও শান্তির জন্য বিভিন্ন ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে। কিন্তু কোনো ডাক্তারই তাদেরকে সুখি করতে পারছে না। তাদের মনের মধ্যে সুখপাখিটা যেন অধরাই রয়ে গেছে। আনন্দ, হাসি আর স্বস্তি কোনোটাই তাদের মাঝে উপস্থিত নেই। এর বিপরীতে রয়েছে নিঃস্ব, গরীব ও অসহায় শ্রেণির মানুষ। এ গরীবেরা ক্রমশ গরীব হয়েই চলেছে। তাদের অবস্থাটাও ধনীদেরই মতো। তাদের কাছেও স্বাদের সুখপাখিটা অধরাই রয়ে গেছে। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও যেন এতটুকু শান্তি-স্বস্তি খুঁজে পাচ্ছে না। সবাই আরও 'কী' যেন পাবার নেশায় ছুটছে। সবাইই দৌড়াচ্ছে সুখপাখিটা ধরতে। কিন্তু উভয় শ্রেণিই এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে। সবার মাঝেই ব্যাপক অস্থিরতা কাজ করছে। মূলত এটা হলো অনৈতিক ভোগবাদিতার অন্ধ আসক্তি। তারা এ আসক্তিতে মারাত্মকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একথাটি আল-কুরআনে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, 'এরা তাদের অবাধ্যতার (নীতিহীনতার) মধ্যে অন্ধের মতো পথ খুঁজে মরছে। তারা হেদায়াতের বিপরীতে গোমরাহি কিনে নিয়েছে। তাদের এ সওদাটি মোটেও লাভজনক নয়। আর তারা মোটেও সঠিক পথে অবস্থান করছে না' *(আল-বাক্বারা, ২/১৬)*। ফলে তারা মূল্যবোধহীন এক বন্য পশুতে পরিণত হয়েছে। সেখান থেকে তারা আর মনুষ্যত্বে ফিরে আসতে পারছে না। 'তাদের চোখ থাকলেও তারা দেখতে পাচ্ছে না, কান থাকতেও তারা শুনতে পাচ্ছে না আর হৃদয় থাকতেও তারা অনুধাবন করতে পারছে না। তারাই হলো চতুষ্পদ জন্তু; অধিকন্তু তারা তদাপেক্ষাও নিকৃষ্ট' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৭৯)*। মূল্যবোধে উজ্জীবিত হতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আল-কুরআন শিক্ষিত হওয়াকে ফরয আমল (আবশ্যিক দায়িত্ব) হিসেবে গণ্য করেছে। আল্লাহ বলেছেন, '(হে নবী) আপনি আপনার প্রভুর নামে পড়ুন! যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১)*। হাদীছে এসেছে, 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান অর্জন করা (ফরয) অবশ্যই কর্তব্য'।[১]

উল্লেখিত শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষিত মানুষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আয়ত্ত করেন। যার কারণে অন্যান্য প্রাণী থেকে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জন করেন। তিনি অন্যান্য প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যান। ফলে তিনি শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় আসীন হয়ে যান। আর এ উপাদানগুলোর সামষ্টিক নাম হলো মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধ। এ মূল্যবোধ অবলম্বনের কারণেই মানুষ পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা জীবের স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু এ উপাদানগুলো মানুষের চেতনায় ও প্রতিভায় ঘুমন্ত থাকে। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে তাই এটাকে আবিষ্কার করতে হয়। মানুষকে তার জীবন চলার প্রতিটি বাঁকে এটাকে চর্চা করতে হয়। জীবনের সকল সুখে, দুঃখে ও প্রেরণায় এটাকে প্রয়োগ করতে হয়। সামাজিক বিভিন্ন উদ্যোগ আর উদ্যমে এগুলোর ব্যবহার জানতে হয়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে এ মূল্যবোধের প্রয়োগ ঘটাতে হয়। ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ও পদক্ষেপে এটির প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিটি কার্যক্রমে এ উপাদানগুলোর অনুশীলন ও প্রয়োগ ঘটাতে হয়। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা আত্মস্থ করতে হয়। আর এ উপাদানগুলোকে নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। মূল্যবোধের সীমা-পরিসীমা বলে কিছু নেই। মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রীতি, প্রেম-ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদিকে মূল্যবোধ বলা হয়ে থাকে। আবার

১. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪, হাদীছ ছহীহ।

ত্যাগ-তীতিক্ষা, সৌজন্য, দয়া, সাধুতা, ক্ষমা, অনুগ্রহ, উদারতা, দূরদৃষ্টি কল্যাণচিন্তা ইত্যাদিও মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত। এসব উপাদান যেসব মানুষ আয়ত্ত করতে পেরেছেন, তাদেরকেই গুণীজন বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পিএইচডি ধারী হওয়া যেমন শর্ত নয়, তেমনি রাষ্ট্রের কোনো বড় অফিসার হওয়াও শর্ত নয়। সমাজের যে কোনো মানুষের মাঝে এ গুণাবলি পাওয়া যেতে পারে। যার মাঝে এসব গুণ পাওয়া যাবে, তাকে ভালো মানুষ বা গুণী মানুষ বলা যেতে পারে। মূলত উল্লেখিত গুণাবলি যাদের মধ্যে থাকে তারা ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তারা সামাজিক যে কোনো কাজে ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করে থাকেন। তারাই সমাজের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে পরিচিতি পান। এসব মানুষের মধ্যে অহংকার থাকে না বললেই চলে। তাদের মধ্যে বসগিরি খুঁজে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েও তারা ক্ষমতার বড়াই করেন না। এসব মানুষের মধ্যে থাকে প্রকৃত দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম। তাদের কাজে-কর্মে সেবার মানসিকতা প্রকাশ পায়। স্ব স্ব কর্মস্থল কর্মচঞ্চল, স্থির ও কর্মময় হয়ে ওঠে। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। ফলে অধীনস্থদের মাঝে কর্মস্পৃহা তৈরি হয়। পারস্পরিক সহযোগী সম্পর্ক তৈরি করতে সবাই উদ্বুদ্ধ হয়। আর একে অপরকে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করে।

মানুষের ঘরে জন্ম নিলেই মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ শব্দটি লিখতে গেলে দুটি শব্দের প্রয়োজন হয়। আর তা হলো ‘মান’ ও ‘হুশ’ = মানুষ। এখানে ‘মান’ বলতে নিজের সম্মানবোধকে বোঝানো হয়েছে। আর হুঁশ বলতে সামগ্রিক চেতনাকে বুঝানো হয়েছে। এই দুটো গুণ যার মধ্যে আছে তাকেই সাধারণত মানুষ বলা হয়ে থাকে। কারণ পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের বসবাস। আর তাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ-দুই শ্রেণির মানুষই বসবাস করছে। এদের মধ্যে যাদের মানবিক গুণাবলি রয়েছে, তাদেরকে শুধু মানুষ বলা সমীচীন। মানুষের মাঝে অন্তর্নিহিত এসব গুণাবলির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মানুষের ব্যক্তিত্ব। মানুষের ক্রমান্বয়ে বয়স বাড়তে থাকে। আর ব্যক্তিত্ব নিরিখেই নির্ধারিত হয় তার পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা। পৃথিবীতে মানুষ বড়ই অনুকরণপ্রিয়। প্রত্যেক মানুষের একটি ছোটকাল থাকে। এই ছোটকাল থেকেই সে কারো না কারো অনুকরণ করতে থাকে। মনের অজান্তেই তাকে অনুসরণ করতে থাকে। এই ছোট মানুষটি বড় হয়ে তার মতো হতে চায়। তার কথা তার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। অনুকরণীয় ব্যক্তিটি হতে পারে তার বাবা। হতে পারে তার কোনো শিক্ষক। হতে পারে ইতিহাসের কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বা অন্য যেকোনো একজন। আমাদের সমাজে এ জাতীয় মানুষের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। অথচ বর্তমান সময়ের দাবি অনুযায়ী এসব মানুষের খুবই প্রয়োজন। অবশ্য যথেষ্ট আন্তরিকতা দিয়ে খুঁজলে কিছুসংখ্যক গুণী মানুষ পাওয়া অসম্ভব নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমাজ থেকে গুণের কদর লোপ পেয়েছে। এ একই কারণে গুণীজনের কদরও শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে। সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে গুণীজনেরা নিজেদেরকে নিভৃতচারী করে রাখার নীতি অবলম্বন করেছেন। নীতিভ্রষ্ট রাজনীতি প্রকৃত গুণীজনদের কোণঠাসা করে রেখেছে। সমাজটা অরাজকতায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সুষ্ঠু সমাজ গড়ার প্রত্যাশা করাটা দুরাশায় পরিণত হয়ে গেছে। অথচ একজন অসৎ লোকের জন্যও সুষ্ঠু ও শান্তিময় সমাজ দরকার। আর শান্তিময় সমাজ পুনঃনির্মাণে উল্লেখিত মূল্যবোধের বিকল্প নেই। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজন মূল্যবোধের জাগরণ। আর এ জাগরণের নেপথ্যে মূল ভূমিকা রাখতে পারেন গুণীজনেরা। আর তাদের মাঠকর্মী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজ। এ দুয়ের সম্মিলিত শক্তিই কেবল সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুন্দর করতে পারে। তাদের সমন্বিত শক্তি আর উদ্যোগই কেবল পারে সামাজিক অবক্ষয় রুখে দিতে। তারাই ফিরিয়ে আনতে পারেন বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া সততা, মননশীলতা, মানবতা আর বদান্যতা। ফিরে আসতে পারে হারানো সকল মানবীয় গুণ। তাদের মাধ্যমে বাংলা আবার পরিণত হতে পারে মূল্যবোধে সিক্ত এক অনুপম জনসমাজ।

অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (১০ম পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ১৭তম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে : *ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র; তিনি বলেন, আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন লায়ছ; তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন উকায়ল থেকে; তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি উরওয়া ইবনু যুবায়ের থেকে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট অহির সূচনা হয় ঘুমে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন সেটিই সকালের মতো তার সামনে সত্যরূপে উদ্ভাসিত হতো। অতঃপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে তিনি হেরা গুহায় নির্জনে সময় কাটান এবং সেখানে বেশ কয়েক রাত্রি ইবাদতে মগ্ন থাকতেন- প্রয়োজনীয় পাথেয় নেওয়ার জন্য পরিবারের কাছে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত। তারপর তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট ফিরে আসতেন, এবং অনুরূপভাবে পাথেয় নিয়ে যেতেন। এভাবেই একদিন তিনি হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় তাঁর নিকট মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাসত্য (অহী) চলে আসে। ফেরেশতা তাঁর নিকটে এসে তাঁকে বলেন, পড়ুন! তিনি বলেন, আমি পড়তে জানি না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ফেরেশতা আমাকে ধরলেন এবং এমনভাবে জোরে চাপ দিলেন যে, আমার খুব কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। ফলে ফেরেশতা আমাকে দ্বিতীয়বার ধরলেন এবং এমনভাবে জোরে চাপ দিলেন যে, আমার খুব কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তিনি আমাকে তৃতীয়বার ধরে এমনভাবে জোরে চাপ দিলেন যে আমার খুব কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, 'পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি (সব কিছু) সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাধা রক্ত হতে। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানিত'।*

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়াতগুলো নিয়ে ফিরে আসেন এসময় তাঁর বুক ধড়ফড় করছিল। তিনি খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! অতঃপর তারা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর তাঁর ভয় কেটে গেলে তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে পুরো ঘটনা জানালেন এবং বললেন, আমি আমার জীবনের ভয় পাচ্ছি। তখন খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, কখনোই নয়! আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অপারগ ব্যক্তির বোঝা বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন, দুর্যোগগ্রস্ত মানুষকে সহযোগিতা করেন।

অতঃপর খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে সাথে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাক্বা ইবনু নওফেলের কাছে নিয়ে যান, যিনি জাহেলী যুগে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হিব্রু ভাষায় বই লিখতেন। আল্লাহ যতটুকু চেয়েছিলেন, তিনি হিব্রু ভাষায় ইঞ্জীল লিখেছিলেন। তিনি একজন বয়োঃবৃদ্ধ ছিলেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কাছে শুনুন (তাঁর বৃত্তান্ত)! তখন ওয়ারাক্বা তাঁকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ভাতিজা, আপনি কী দেখেছেন? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা দেখেছিলেন তাঁকে তা জানালেন। অতঃপর ওয়ারাক্বা তাঁকে বললেন, ইনিই সেই 'নামূস' (গোপন বার্তাবাহক অর্থাৎ জিবরীল) যাকে মহান আল্লাহ মূসার নিকট পাঠিয়েছিলেন। হায়! যদি আমি সে সময় যুবক থাকতাম এবং যদি আমি সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম যেদিন আপনার জাতি আপনাকে বের করে দিবে! তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দিবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, ইতোপূর্বে যে ব্যক্তিই এই বার্তা নিয়ে এসেছে, যে বার্তা নিয়ে আপনি এসেছেন, তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। আপনার সে সময় পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে আমি আপনাকে মযবূতভাবে সহযোগিতা করব। কিন্তু কিছুদিন পর ওয়ারাক্বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তেকাল করেন। আর অহি কিছু দিনের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) ও আবূ ছালেহ (রাহিমাহুল্লাহ) অনুরূপ (অর্থাৎ فؤاده শব্দ) বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইবনু রাদদাদ (রাহিমাহুল্লাহ) যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম যুহরী থেকে ইউনুস ও মা'মার (রাহিমাহুমাল্লাহ) فؤاده এর স্থলে بَوَادِرُهُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।]

কুরআনে প্রথম কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে?

মূল হাদীছের শেষে উক্ত খণ্ডিত হাদীছ উল্লেখ করার পেছনে ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মূল কারণ হচ্ছে, সর্বপ্রথম কোন অহি অবতীর্ণ হয়েছে সেই বিতর্কের সমাধান করা এবং অহি সাময়িক স্থগিত হওয়ার পর পুনরায় কোন আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে অহি নতুন করে শুরু করা হয় সেটা আলোকপাত করা। সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে একদল আলেমের মতে, প্রথম অবতীর্ণ হওয়া অহি হচ্ছে সূরা মুদ্দাছছির। তাদের দলীল নিম্নের হাদীছটি—

الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ أَوِ اقْرَأْ؟ فَقَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ أَوْ اقْرَأْ؟ قَالَ جَابِرٌ

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي، فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ يَعْنِي جِبْرِيلَ ﷺ فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُونِي فَدَثَّرُونِي فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}

ইমাম আওযাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইয়াহইয়াকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি আবূ সালামাকে জিজ্ঞেস করেছি কুরআনের কোন আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, ইয়া আইয়ূহাল মুদ্দাছছির। আমি বললাম, না-কি ইক্বরা? তিনি বললেন, আমি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, ইয়া আইয়ূহাল মুদ্দাছছির। আমি বললাম, না-কি ইক্বরা? তখন জাবের বললেন, আমি তোমাকে সেই হাদীছ শুনাচ্ছি যা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শুনিয়েছেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি হেরা গুহায় এক মাস অবস্থান করলাম। আমার অবস্থান শেষ করে যখন আমি নেমে আসছিলাম এবং উপত্যকার মাঝামাঝি পৌঁছলাম তখন আমাকে ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি আমার সামনে-পেছনে, ডানে-বামে তাকালাম কিন্তু সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না। আমাকে পুনরায় ডাকা হলো, আমি পুনরায় তাকালাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। অতঃপর আমাকে পুনরায় ডাকা হলো, আমি আমার মাথা উঁচু করে দেখতে পেলাম জিবরীল আলাইহিস সালাম খোলা বায়ুমণ্ডলে বিশাল আসনের উপর বসে আছেন। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। আমি খাদীজার নিকট আসলাম এবং বললাম, আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দাও! আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দাও! তারা আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দেন এবং আমার মাথায় পানি ঢালেন। অতঃপর মহান আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করেন, ‘হে চাদরাবৃত ব্যক্তি! উঠুন! (মানুষকে) সতর্ক করুন! আপনার প্রতিপালকের বড়ত্ব করুন! আপনার বস্ত্র পরিষ্কার করুন![১]

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬১।

উভয় হাদীছের মধ্যে বিরোধের সমাধান :

(১) ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ মূলত এই হাদীছের জবাব দেওয়ার জন্যই মূল হাদীছের শেষে আলোচ্য হাদীছটি পেশ করেছেন। আমরা গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব, ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর আলোচ্য হাদীছ এবং এই হাদীছ উভয়ের সনদ একই। উভয় হাদীছই জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন। পার্থক্য হচ্ছে আবূ সালামা থেকে এই হাদীছ ইয়াহইয়া বর্ণনা করেছেন আর ইমাম বুখারীর আলোচ্য হাদীছ আবূ সালামা থেকে যুহরী বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী যুহরী থেকে যে বর্ণনা পেশ করেছেন সেখানে এমন কিছু দলীল রয়েছে, যা প্রমাণ করে এই হাদীছটি অহি বন্ধ হওয়ার পরের ঘটনা। প্রথম অহির ঘটনা নয়। যেমন—

(ক)

فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ.

‘আমি তখন সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম যাকে আমি হেরা গুহায় দেখেছি’। উক্ত বাক্য প্রমাণ করে মুদ্দাছছির অবতীর্ণ হওয়ার আগেও একবার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ফেরেশতাকে হেরা গুহায় দেখেছেন। তথা মুদ্দাছছির প্রথম অবতীর্ণ হওয়া অহি নয়, বরং তার পূর্বে হেরা গুহায় প্রথম অহি অবতীর্ণ হয়েছে আর তা হচ্ছে ইক্বরা।

(খ) ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীরের এই বর্ণনায় বলা হয়েছে— প্রথম অহি তখন আসে যখন তিনি পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ার পরে আওয়াজ শুনতে পান। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে পান না। তারপর তিনি খাদীজার নিকট ফিরে যান। তিনি তার মাথায় পানি ঢেলে দিলে তখন তাঁর কাছে প্রথম অহি মুদ্দাছছির আসে। উক্ত ঘটনাক্রম স্পষ্ট প্রমাণ করে, বর্ণনাকারী এই বর্ণনায় ভুল করেছেন। কেননা প্রথম অহি হেরা পাহাড়ের উপরেই এসেছে। খাদীজার নিকট যাওয়ার আগেই। দ্বিতীয়ত, প্রথম অহির সময় জিবরীল আলাইহিস সালাম তাকে সজোরে চেপে ধরার পর অহি অবতীর্ণ হয়। তিনি জিবরীলকে দেখতে পান। তাঁর সাথে কথা বলেন। অথচ এই হাদীছে জিবরীলকে দেখতে পাওয়ার কোনো বর্ণনা নাই। শুধু আওয়াজ শ্রবণের কথা রয়েছে। শুধু আওয়াজ

শ্রবণের মাধ্যমে ফেরেশতাকে না দেখেই প্রথম অহির কল্পনা করা বিবেকপ্রসূত নয়। সুতরাং ইমাম বুখারীর আলোচ্য হাদীছই বেশি বিশুদ্ধ যেখানে আওয়াজ শ্রবণের পর মধ্য গগনে ফেরেশতাকে দ্বিতীয়বারের মতো দেখতে পান এবং তিনি চিনতে পারেন যে, এই সেই ফেরেশতা যিনি হেরা গুহায় তাঁর নিকটে এসেছিলেন।

(গ) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বর্ণিত বুখারীর হাদীছে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, 'ইক্বরা' অবতীর্ণ হওয়ার আগে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে জানতেন না। যা প্রমাণ বহন করে যে, 'ইক্বরা'-ই প্রথম অবতীর্ণ আয়াত।

(ঘ) আর 'মুদ্দাছছির'-এ মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আনযির' তথা মানুষকে সর্তক করুন! তাকে চাদরমুড়ি দেওয়া থেকে উঠে দাওয়াতী কাজ করতে বলেছেন। অথচ তিনি না পড়লে না জানলে কীভাবে মানুষকে সর্তক করবেন। সুতরাং আয়াতের অন্তর্ভুক্ত বাক্যবলিও প্রমাণ করে 'ইক্বরা' প্রথম অবতীর্ণ আয়াত। যেখানে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর প্রতিপালকের সাথে পরিচিত করা হয়েছে।

(ঙ) সর্বোপরি আবূ সালামা থেকে এই হাদীছ ইয়াহইয়া বর্ণনা করেছেন আর ইমাম বুখারীর পেশ করা হাদীছ যুহরী বর্ণনা করেছেন। আর যুহরী ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর থেকে অনেক মযবূত। সুতরাং তাঁর বর্ণনা বেশি প্রাধান্য পাবে।

(চ) আর যদি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীরের বর্ণনাকেই বেশি বিশুদ্ধ মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আমাদের উত্তর হবে উনি হয়তো প্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরার দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্দাছছিরের কথা বলেছেন। 'আমভাবে প্রথম অবতীর্ণ অহির ক্ষেত্রে নয়। যেমনটি উক্ত হাদীছের অন্য সনদে পাওয়া যায়। যথা—

أي القرآن أنزل أول؟ قال: يا أيها المدثر قال: قلت: فأي آيتين أول سورة نزلت؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق.

আবূ সালামা জাবেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কুরআনের প্রথম কি অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, 'মুদ্দাছছির'। আমি বললাম, কোন আয়াত দুটি প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, 'ইক্বরা'।[২]

২. ইবনুয যুরায়স আল-বাজালী, ফাযায়েলে কুরআন, ১/৩৮।

কত দিন অহি আসা বন্ধ ছিল এবং কেন?

উক্ত হাদীছের মূল আলোচ্য বিষয় অহির বিরতি। প্রথম অহির সময় সূরা আলাক্বের পাঁচ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর দীর্ঘদিন অহি আসা বন্ধ থাকে। এই বিরতির সময়কালকে 'ফাতরাতুল অহি' বলা হয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সাময়িকভাবে অহি স্থগিত হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নাই। আর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী দুইবার অহি স্থগিত হয়েছিল। প্রথমবার 'ইক্বরা'-এর পরে এবং মুদ্দাছছিরের পূর্ব পর্যন্ত। দ্বিতীয়বার মুদ্দাচ্ছির, মুযাম্মিলের মতো কয়েকটি সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর সূরা যুহা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বপর্যন্ত। তবে এই দুই বারে কত দিন করে অহি আসা স্থগিত ছিল, এই বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে স্পষ্ট কোনো নাছ বা বক্তব্য নেই। স্পষ্ট নাছ না থাকার কারণে উলামায়ে কেরামের গবেষণায় বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। ইবনু আশূর রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন মত পর্যালোচনার পর যে মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা হচ্ছে— প্রথমবার অহি বন্ধ ছিল ৪০ দিন এবং দ্বিতীয়বার অহি বন্ধ ছিল তিন থেকে চার দিন মাত্র।[৩]

অহি বিরতির কারণ :

আমরা বাস্তব জীবনে দেখি, যখন কারো সাথে প্রথম প্রথম বন্ধুত্ব হয় তখন অভিমান করে কিছু দিন কথা না বললে সাক্ষাৎ ও কথা বলার আগ্রহ বাড়তে থাকে। বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়। মহান আল্লাহ প্রথমবার অহি পাঠানোর পর অহি পাঠানো বন্ধ করেন মূলত এই কারণেই। যাতে করে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে অহির প্রতি আগ্রহ ও অপেক্ষা বাড়তে থাকে। এই আগ্রহ ও অপেক্ষা এত বেশি হয় যাতে অহি আসা পুনরায় শুরু করলে উনি পূর্ণরূপে অহি ও রিসালাতের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সবকিছু ১৬ আনা অনুভব করতে পারেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(চলবে)

৩. আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, ৩০/৩৯৬; ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/৪১।

দাজ্জাল সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

-আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী*

(পর্ব-৪)

হাদীছ-১২ : আবূ উমামা আল-বাহেলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আমাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তাঁর দীর্ঘ ভাষণের অধিকাংশ ছিল দাজ্জাল প্রসঙ্গে। তিনি আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেন। তার সম্পর্কে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, আল্লাহ আদমের বংশধর সৃষ্টি করার পর থেকে দাজ্জালের ফেতনার চেয়ে মারাত্মক কোনো ফেতনা পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে না। আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি, যিনি তাঁর উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। আর আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করবে। আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয়, তবে আমিই প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হব। আর যদি সে আমার পরে আবির্ভূত হয়, তবে প্রত্যেক মুসলিমকে নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হতে হবে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার প্রতিনিধি। নিশ্চয় সে সিরিয়া ও ইরাকের 'খাল্লা' নামক স্থান থেকে বের হবে। অতঃপর সে তার ডানে ও বামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকবে। কেননা আমি এখনই তোমাদের নিকট এমন সব নিকৃষ্ট অবস্থা বর্ণনা করব যা আমার পূর্বে, বিশেষভাবে কোনো নবীই তাঁর উম্মতের নিকট বলেননি। সে তার দাবির সূচনায় বলবে, আমি নবী। অথচ আমার পরে কোনো নবী নেই। অতঃপর সে দাবি করবে, আমি তোমাদের রব। অথচ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে না। সে হবে অন্ধ। অথচ তোমাদের রব মোটেই অন্ধ নন। তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফের'। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই এ লেখাটি পড়তে সক্ষম হবে। দাজ্জালের অনাসৃষ্টির মধ্যে একটি এই যে, তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তবে তার জাহান্নাম হবে 'জান্নাত' এবং তার জান্নাত হবে 'জাহান্নাম'। যে ব্যক্তি তার জাহান্নামের বিপদে পতিত হবে, সে যেন আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সূরা কাহফ-এর প্রথমাংশ তেলাওয়াত করে। তাহলে সেই জাহান্নাম হবে তার জন্য শীতল আরামদায়ক, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বেলায় আগুন যেরূপ হয়েছিল।

বলবে, আমি যদি তোমার পিতা-মাতাকে তোমার সামনে জীবিত করে তুলতে পারি, তবে তুমি কি এই সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আমি তোমার রব? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন (দাজ্জালের নির্দেশে) দুটি শয়তান তার পিতা-মাতার অবয়ব ধারণ করে হাযির হবে এবং বলবে, হে বৎস! তার অনুগত্য করো। সে-ই তোমার রব।

দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে জনৈক ব্যক্তিকে পরাভূত করে হত্যা করবে। অতঃপর করাত দ্বারা তাকে ফেড়ে দুই টুকরা করে ছুঁড়ে মারবে। অতঃপর সে বলবে, তোমরা আমার এ বান্দার দিকে লক্ষ্য করো। আমি একে এখনই জীবিত করব। তারপরও কেউ বলবে কি যে, আমি ব্যতীত তার অন্য কেউ রব আছে? এরপর আল্লাহ তাআলা সে লোকটিকে জীবিত করবেন। তখন খবীস (দাজ্জাল) তাকে বলবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। আর তুই তো আল্লাহর দুশমন। তুই তো দাজ্জাল। আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোর সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারছি (যে, তুই-ই দাজ্জাল)।

আবুল হাসান আত-তানাফুসী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে জান্নাতে সে ব্যক্তির সর্বাধিক মর্যাদা হবে। রাবী বলেন, আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা ধারণা করতাম যে, এ ব্যক্তি উমর ইবনুল খাত্ত্বাব। এমনকি তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন।

মুহারিবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এরপর আমরা আবূ রাফে (রহিমাহুল্লাহ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে ফিরে যাচ্ছি। তিনি বলেন, দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষাতে নির্দেশ দিলে বৃষ্টি হবে এবং যমীনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিলে ফসল উৎপাদিত হবে।

দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে একটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। ফলে তাদের গবাদি পশু সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে আরেকটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দিলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিলে যমীন শস্য উৎপাদন করবে। যমীন পর্যাপ্ত ফসলাদি, ঘাসপাতা ও তৃণলতা উদগত

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

করবে। এমনকি তাদের গবাদি পশু সেদিন সন্ধ্যায় মোটাতাজা এবং উদর পূর্তি করে দুধে স্তন ফুলিয়ে বাড়িতে ফিরে আসবে।

অবস্থা এই হবে যে, সে গোটা দুনিয়া চষে বেড়াবে এবং তা তার পদানত হবে, মক্কা ও মদীনা ব্যতীত। এই দুই শহরের প্রবেশদ্বারে উন্মুক্ত তরবারিসহ সশস্ত্র অবস্থায় ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে। শেষে সে একটি ক্ষুদ্র লাল পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করবে। যা হবে তৃণলতা শূন্য স্থানের শেষভাগ।

এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিন বার প্রকম্পিত হবে। ফলে মুনাফেক্ব নারী-পুরুষ মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে যোগ দিবে। এভাবে মদীনা তার ভেতরকার নিকৃষ্ট ময়লা বিদূরিত করবে। যেমনভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে। সে দিনের নাম হবে 'নাজাত দিবস'।

আবুল আকার-কন্যা উম্মু শুরাইক (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আরবের লোকেরা তৎকালে কোথায় থাকবে? তিনি বলেন, তৎকালে তাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য। তাদের অধিকাংশ (ঈমানদার) বান্দা তখন বায়তুল মুক্বাদ্দাসে অবস্থান করবে। তাদের ইমাম হবেন একজন নিষ্ঠাবান সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি।

এমতাবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফজরের ছালাত পড়বেন। ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) সেই সকালবেলা অবতরণ করবেন। তখন ইমাম পেছন দিকে সরে আসবেন, যেন ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদের ছালাতে ইমামতি করতে পারেন। ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর হাত ইমামের দুই কাঁধের উপর রেখে বলবেন, আপনি অগ্রবর্তী হয়ে ছালাতে ইমামতি করুন। কেননা এই ছালাত আপনার জন্যই ক্বায়েম হয়েছে। অতএব তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে ছালাত পড়বেন।

তিনি ছালাত থেকে অবসর হলে ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলবেন, দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং দরজার পেছনে দাজ্জাল অবস্থানরত থাকবে। তার সাথে থাকবে ৭০ হাজার ইয়াহূদী কারুকার্যখচিত ও খাপবদ্ধ তরবারিসহ। দাজ্জাল ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে দেখামাত্র পানিতে লবণ বিগলিত হওয়ার ন্যায় বিগলিত হতে থাকবে এবং ভয়ে পলায়ন করতে থাকবে। তখন ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলবেন, তোর উপর আমার একটা আঘাত আছে, যা থেকে তোর বাঁচার কোনো উপায় নেই। তিনি লুদ্দ-এর পূর্ব ফটকে তার নাগাল পেয়ে যাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইয়াহূদীদের পরাজিত করবেন। আল্লাহর সৃষ্টি যে কোনো বস্তু-পাথর, গাছপালা, দেয়াল অথবা প্রাণী, যার আড়ালেই কোনো ইহূদী লুকিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে বাকশক্তি দান করবেন এবং সে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর মুসলিম বান্দা! এই যে এক ইয়াহূদী, এদিকে এসো এবং তাকে হত্যা করো। তবে গারক্বাদ নামক গাছ কথা বলবে না। কারণ সেটা ইয়াহূদীদের গাছ।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, দাজ্জাল ৪০ বছর বিপর্যয় ছড়াবে। তার এক বছর হবে অর্ধ বছরের সমান, এক বছর হবে এক মাসের সমান, এক মাস এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্টকাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বায়ুমণ্ডলে উড়ে যাওয়ার মতো দ্রুত অতিক্রান্ত হবে। তোমাদের কেউ সকালবেলা মদীনার এক ফটকে থাকলে তার অপর ফটকে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এত ক্ষুদ্র দিনে আমরা কীভাবে ছালাত পড়ব? তিনি বলেন, তোমরা অনুমান করে ছালাতের সময় নির্ধারণ করবে, যেমন তোমরা লম্বা দিনে অনুমান করে ছালাতের সময় নির্ধারণ করে থাক এবং এভাবে ছালাত আদায় করবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) আমার উম্মতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনছাফকারী ইমাম হবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। এমনভাবে শূকর হত্যা করবেন যে, তার একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তিনি জিযইয়া মওকূফ করবেন। যাকাত আদায় বন্ধ করবেন এবং না বকরির উপর যাকাত ধার্য করা হবে, আর না উটের উপর। লোকদের মাঝে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান হবে। প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণী বিষশূন্য হয়ে যাবে। এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশু তার হাত সাপের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিবে। কিন্তু তা তার কোনো ক্ষতি করবে না। এক ক্ষুদ্র মানবশিশু সিংহকে তাড়া করবে। তা তার কোনো ক্ষতি করবে না। নেকড়ে বাঘ মেষ পালের সাথে এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তা তার পাহারায় রত কুকুর। পানিতে পাত্র পরিপূর্ণ হওয়ার মতো পৃথিবী শান্তিতে পূর্ণ হয়ে যাবে। সকলের কালেমা এক হয়ে যাবে।

আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সাজ-সরঞ্জাম রেখে দিবে। কুরাইশদের রাজত্বের অবসান হবে। পৃথিবী রূপার পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে যাবে। তাতে এমন সব ফলমূল উৎপন্ন হবে, যেমনটি আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে উৎপাদিত হতো। এমনকি কয়েকজন লোক একটি আঙুরের থোকার মধ্যে একত্র হতে পারবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। অনেক লোক একটি ডালিমের জন্য একত্র হবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। তাদের বলদ গরু হবে এই এই (উচ্চ) মূল্যের এবং ঘোড়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হবে। লোকজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়া সস্তা হবে কেন? তিনি বলেন, কারণ যুদ্ধের জন্য কখনো কেউ অশ্বারোহী হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, গরু অতি মূল্যবান হবে কেন? তিনি বলেন, সারা পৃথিবীতে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে।

দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তখন মানুষ চরমভাবে অন্নকষ্ট ভোগ করবে। প্রথম বছর আল্লাহ তাআলা আসমানকে তিন ভাগের এক ভাগ বৃষ্টি আটকে রাখার নির্দেশ দিবেন এবং যমীনকে নির্দেশ দিলে তা

এক-তৃতীয়াংশ ফসলের কম উৎপাদন করবে। এরপর তিনি আসমানকে দ্বিতীয় বছর একই নির্দেশ দিলে, তা দুই-তৃতীয়াংশ কম বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং যমীনকে হুকুম দিলে তাও দুই-তৃতীয়াংশ কম ফসল উৎপন্ন করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা আকাশকে তৃতীয় বছরে একই নির্দেশ দিলে তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিবে। ফলে এক ফোঁটা বৃষ্টিও বর্ষিত হবে না। আর তিনি যমীনকে নির্দেশ দিলে তা শস্য উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখবে। ফলে যমীনে কোনো ঘাস জন্মাবে না, কোনো সবজি অবশিষ্ট থাকবে না। বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যা চাইবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, এ সময় লোকেরা কীভাবে বেঁচে থাকবে? তিনি বলেন, যারা তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বলতে থাকবে; তাদের খাদ্যনালীতে এসব যিকির-আযকার প্রবাহিত হবে।[১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এতে দুটি সমস্যা রয়েছে। **প্রথমত,** এখানে মুহারিবী নামক একজন রাবী তাদলীস করেছেন। **দ্বিতীয়ত,** অপর রাবী ইসমাঈল ইবনু রাফে‘ যঈফ রাবী।[২]

হাদীছ-১৩ : ‘যখন লোকেরা দাজ্জালের কথা ভুলে যাবে ও খত্বীবগণ মেম্বারে তার কথা বলা বর্জন করবে, তখন দাজ্জাল বের হবে’।[৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ হাদীছ। ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘এই বর্ণনায় ইরসাল রয়েছে’।[৪]

হাদীছ-১৪ : ‘ইবনু মুলায়কা (রহিমাহুল্লাহ আনহু) একদা রাতে ঘুমাতে পারলেন না। কেননা তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, দাজ্জাল ইতোমধ্যে আবির্ভাব হয়ে গেছে’।[৫]

তাহক্বীক্ব : প্রথমত, ইবনু জুরাইজ তাদলীস করেছেন।[৬] **দ্বিতীয়ত,** এটি একজন ছাহাবীর স্বপ্ন, যা কোনো দলীল নয়। নবীদের স্বপ্ন অহী হয়ে থাকে। কিন্তু উম্মতের স্বপ্ন অহী নয়। উম্মতের স্বপ্ন সত্য-মিথ্যা উভয়ের-ই সম্ভাবনা রাখে।

হাদীছ-১৫ :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ لِلدَّجَّالِ آيَاتٌ مَعْلُومَاتٌ إِذَا غَارَتِ الْعُيُونُ وَنَزَفَتِ الْأَنْهَارُ وَاصْفَرَّ الرَّيْحَانُ وَانْتَقَلَتْ مَذْحِجُ وَهَمْدَانُ مِنَ الْعِرَاقِ فَنَزَلَتْ قِنَّسْرِينَ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ غَادِيًا أَوْ رَائِحًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

‘দাজ্জাল আগমনের তিনটি প্রসিদ্ধ নিদর্শন রয়েছে। ১. যখন ঝর্ণাসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে। ২. নদীগুলো শুকিয়ে যাবে। ৩. ফুলগুলো হলুদ হয়ে যাবে। ৪. মাযহিজ ও হামাদান ইরাক হতে স্থানান্তরিত হয়ে কিন্নাসরীনে চলে যাবে। তখন তোমরা দাজ্জালের আবির্ভাবের অপেক্ষায় থাকবে। সে সকাল-সন্ধ্যা যে কোনো সময়ে আত্মপ্রকাশ করবে’।[৭]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সনদ যঈফ। কেননা এর রাবী ফযল ইবনু মুহাম্মাদ শারানী একজন বিতর্কিত রাবী। মুহাদ্দিছগণ তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন।[৮] তার কট্টরপন্থী শীআ মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে ইবনুল আখরামের একটি মন্তব্য পাওয়া গেলেও তার কোনো সনদ পাওয়া যায় না। সেজন্য সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো না। যদিও পরবর্তী কিছু ইমাম উদ্ধৃত করেছেন।

হাদীছ-১৬ : ‘তোমরা জর্ডান নদীর পাড়ে দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে’।

তাহক্বীক্ব : যঈফ হাদীছ। এর রাবী মুহাম্মাদ ইবনু আবান যঈফ রাবী।[৯]

হাদীছ-১৭ : ‘সূরা কাহফের তিনটি আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালের ফেতনা হতে মুক্তি পাওয়া যাবে’।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি শায।[১০]

হাদীছ-১৮ : ‘দাজ্জাল বের হবে যখন দ্বীনের অবস্থা দুর্বল হবে এবং জ্ঞান হতে লোকেরা দূরে সরে যাবে’।

তাহক্বীক্ব : যঈফ হাদীছ। আবুয যুবায়ের মুদাল্লিস রাবী।[১১]

হাদীছ-১৯ : ‘দুজন ব্যক্তি ঈসা ইবনু মারইয়ামকে পাবে এবং তারা দাজ্জালকে হত্যা করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে’।

তাহক্বীক্ব : যঈফ হাদীছ। এর রাবী ‘আব্বাদ’ দুর্বল।[১২]

হাদীছ-২০ : ‘দাজ্জালের যামানায় ফেরেশতাদের খাদ্যই হবে মুমিনদের খাদ্য। অর্থাৎ তাসবীহ, তাকদীস ইত্যাদি। যে একবার তাসবীহ ও তাকদীস পাঠ করবে, সে আর ক্ষুধার্ত হবে না’।

তাহক্বীক্ব : অত্যন্ত যঈফ। এর রাবী ‘সাঈদ’ মিথ্যার দোষে দুষ্ট।[১৩]

(চলবে)

১. ইবনু মাজাহ, হা/৪০৭৭।
২. যুবায়ের আলী যাঈ, ইবনু মাজাহ, ৫/৩৭৬।
৩. আহমাদ, হা/১৬৬৬৭; আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, হা/৯০৭; মুসনাদুশ শামিঈন, হা/৯৯২।
৪. আল-ইসাবাহ, ৩/৩৪৫; আরও দেখুন : তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭৩৬, ৪/৪২১।
৫. আল-মুসতাদরাক হাকেম, হা/৮৪১৯।
৬. ইবনু হাজার, তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৮৩।
৭. মুসতাদরাক হাকেম, হা/৮৪২০।
৮. ইবনু আবী হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তাদীল, রাবী নং ৩৯৩।
৯. সিলসিলা যঈফা, হা/১২৯৭।
১০. সিলসিলা যঈফা, হা/১৩৩৬।
১১. সিলসিলা যঈফা, হা/১৯৬৯।
১২. সিলসিলা যঈফা, হা/৩৭১৬।
১৩. সিলসিলা যঈফা, হা/৩৮২৫।

প্রসঙ্গ : ছফর মাসকেন্দ্রিক জাহেলিয়াত, অশুভত্ব, কুসংস্কার এবং আখেরী চাহার শোম্বা বিষয়ক বিদআত

*-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন**

ছফর মাস হলো হিজরী বর্ষের দ্বিতীয় মাস। 'ছিফর' মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত হলে 'ছফর' মানে হবে শূন্য, রিক্ত। আর 'ছাফর' ক্রিয়ামূল থেকে উৎপন্ন হলে অর্থ হবে হলুদ, হলদেটে, তামাটে, বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, পান্ডুবর্ণ, ফিকে, ঔজ্জ্বল্যবিহীন, দীপ্তিহীন, রক্তশূন্য ইত্যাদি। আরবরা এককালে সৌরবর্ষ হিসাব করত; চান্দ্রমাস গণনা করলেও ঋতু ঠিক রাখার জন্য প্রতি তিন বছর অন্তর বর্ধিত এক মাস যোগ করে ১৩ মাসে বছর ধরে সৌরবর্ষের সঙ্গে সমন্বয় করত। সুতরাং মাসগুলো মোটামুটিভাবে ঋতুতে স্থিত থাকত। ঋতু ও ফল-ফসলের সঙ্গে আরবদের জীবনের সব ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত হতো। আরব দেশে সে সময় ছফর মাসে খরা হতো এবং খাদ্যসংকট, আকাল দেখা দিত। মাঠঘাট শুকিয়ে চৌচির, বিবর্ণ ও তামাটে হয়ে যেত। ক্ষুধার্ত মানুষের চেহারা রক্তশূন্য ও ফ্যাকাশে হতো। তাই তারা বলত 'আছ-ছাফারুল মুছাফফার', অর্থাৎ 'বিবর্ণ ছফর মাস'। আরবের জাহেলরা এই মাসকে দুঃখ-কষ্টের মাস মনে করে চাঁদ দেখা থেকেও বিরত থাকত এবং দ্রুত মাস শেষ হওয়ার অপেক্ষা করত।[১]

ছফর মাস মূলত মুহাররম মাসের জোড়া মাস ছিল। জাহেলী যুগে মুহাররম ও ছফর এই দুই মাসের নাম ছিল— 'আছ-ছফরুল আউয়াল' ও 'আছ-ছফরুছ ছানী', অর্থাৎ 'প্রথম ছফর' ও 'দ্বিতীয় ছফর'। বছরের প্রথম মাস তথা 'আছ-ছফরুল আউয়াল', যা বর্তমানে 'মুহাররম'। এ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ তখনো নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু আরবের লোকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের সুবিধামতো অনৈতিকভাবে এ মাস দু'টি আগে-পরে নিয়ে যেত। তাই পরবর্তী সময়ে তাদের এ অপকৌশল নিরসনের জন্য প্রথম মাসের নামকরণ করা হয় মুহাররম (নিষিদ্ধ); সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মাসের বিশেষণ 'আছ-ছানী' বা 'দ্বিতীয়' শব্দটিও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ফলে এ দুই মাসের নাম পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান 'মুহাররম' ও 'ছফর' রূপ লাভ করে। এ দুই মাস মিলে একই ঋতু।

ছফর মাসকে কেন্দ্র করে অনেক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা বিশেষ করে ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে। এমনকি এদেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও এই মাসের 'ফযীলতের' মনগড়া-বানোয়াট ও মিথ্যা কথা যেমন লেখেন, তেমনি এ মাসের শেষ বুধবার স্পষ্ট বিদআতী দিবস আখেরী চাহার শোম্বা নামে সরকারি ছুটির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা হয়।

ছফর মাসকেন্দ্রিক জাহেলিয়াত এবং বিদআতকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) ছফর মাসের 'অশুভত্ব' ও 'বালা-মুছীবত'-বিষয়ক জাহেলিয়াত, (২) ছফর মাসের প্রথম তারিখ বা অন্য সময়ে বিশেষ ছালাতকেন্দ্রিক বিদআত ও (৩) আখেরী চাহার শোম্বা বা ছফর মাসের শেষ বুধবারবিষয়ক বিদআত।

ছফর মাসের 'অশুভত্ব' ও 'বালা-মুছীবত' কোনো স্থান, সময়, বস্তু বা কর্মকে অশুভ, অযাত্রা, বা অমঙ্গলময় বলে মনে করা ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী একটি কুসংস্কার। আরবের মানুষরা জাহেলী যুগ থেকে ছফর মাসকে অশুভ ও বিপদ-আপদের মাস বলে বিশ্বাস করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করে বলেন, 'কোনো অশুভ অযাত্রা নেই, কোনো ভূতপ্রেত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই এবং ছফর মাসের অশুভত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই'।[২]

অথচ এরপরও মুসলিম সমাজে অনেকের মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের এ সকল কুসংস্কার থেকে যায়। শুধু তাই নয়, এ সকল কুসংস্কারকে উস্কে দেওয়ার জন্য অনেক বানোয়াট কথা হাদীছের নামে বানিয়ে বানিয়ে সমাজে প্রচার করেছে এক শ্রেণির জালিয়াতীচক্র। তারা জালিয়াতী করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে যে সকল মিথ্যাচার করেছে, সেগুলোর মধ্যে কতগুলো নিম্নরূপ—

(১) এই মাস বালা-মুছীবতের মাস। এই মাসে এত লক্ষ এত হাজার... বালা নাযিল হয়।

(২) এই মাসেই আদম আলাইহিস সালাম ফল খেয়েছিলেন।

(৩) এ মাসেই হাবীল তার সহোদর ভাই কাবীল দ্বারা নিহত হন।

(৪) এ মাসেই নূহ আলাইহিস সালাম-এর ক্বওম ধ্বংস হয়।

(৫) এ মাসেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে আগুনে ফেলা হয়।

(৬) এ মাসের আগমনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যথিত হতেন। এই মাস চলে গেলে খুশী হতেন।

(৭) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে ছফর মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করবে, আমি তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদ প্রদান করব'।

এছাড়াও আরো অনেক কথা জালিয়াতরা বানিয়েছে। আর অনেক আলেম-বুজুর্গ আর সরলপ্রাণ মুসলিমরা তাদের এ

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনু মানযূর রহিমাহুল্লাহ, লিসানুল আরাব, ৪/৪৬২-৪৬৩।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৪৬, ৫৭০৭, ৫৭৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬৮৩-৫৬৯০।

সকল জালিয়াতী বিশ্বাস করে ফেলেছেন। মুহাদ্দিছগণ একমত যে, ছফর মাসের অশুভত্ব ও বালা-মুছীবতবিষয়ক সকল কথাই ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও বানোয়াট।

উপরিউক্ত মিথ্যা কথাগুলোর ভিত্তিতেই একটি ভিত্তিহীন ‘ছালাতের’ উদ্ভাবন করা হয়েছ ছফর মাসের প্রথম রাতে। এ ছালাত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কেউ যদি ছফর মাসের প্রথম রাত্রিতে মাগরিবের পরে বা এশার পরে চার রাকআত ছালাত আদায় করে, অমুক অমুক সূরা বা আয়াত এতবার পাঠ করে, তবে সে বিপদ থেকে রক্ষা পাবে, এত পুরস্কার পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা, যদিও অনেক সরলপ্রাণ আলেম-বুজুর্গ ব্যক্তিও এগুলো বিশ্বাস করেছেন আর তাদের লিখিত বইয়ে ও ওয়াযে এ সকল মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ফযীলত উল্লেখ করেছেন।[৩]

ছফর মাসের শেষ বুধবারকে বিভিন্ন জাল হাদীছে বলা হয়েছে অশুভ এবং যে কোনো মাসের শেষ বুধবার সবচেয়ে অশুভ দিন। আর ছফর মাস যেহেতু অশুভ, সেহেতু ছফর মাসের শেষ বুধবার বছরের সবচেয়ে অশুভ দিন এবং এই দিনে সবচেয়ে বেশি বালা-মুছীবত নাযিল হয়। নাঊযুবিল্লাহ। এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা অনেক সরলপ্রাণ মুসলিমরা বিশ্বাস করেছেন। একজন লিখেছেন, ‘ছফর মাসে ১ লাখ ২০ হাজার ‘বালা’ নাযিল হয় এবং সব দিনের চেয়ে বেশি আখেরী চাহার শোম্বাতে (ছফর মাসের শেষ বুধবার) নাযিল হয় সবচেয়ে বেশি। সুতরাং ঐ দিনে যে ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত নিয়মে চার রাকআত ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ঐ বালা হতে রক্ষা করবেন এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত তাঁকে হেফাযতে রাখবেন।[৪]

এগুলো সবই ভিত্তিহীন কথা। তবে আমাদের দেশে বর্তমানে ‘আখেরী চাহার শোম্বা’-এর প্রসিদ্ধি এই কারণে নয়, অন্য কারণে। প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছফর মাসের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ছফর মাসের শেষ বুধবারে কিছুটা সুস্থ হন এবং গোসল করেন। এরপর তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এই অসুস্থতাতেই তিনি পরের মাসে ইন্তেকাল করেন। এজন্য মুসলিমরা এই দিনে তাঁর সর্বশেষ সুস্থতা ও গোসলের স্মৃতি উদযাপন করেন।

এ বিষয়ে প্রচলিত কাহিনীর সারসংক্ষেপ প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করা হলো, ‘হজরত নবী করিম (সাঃ) দুনিয়া হইতে বিদায় নিবার পূর্ববর্তী সফর মাসের শেষ সপ্তাহে ভীষণভাবে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি এই মাসের শেষ বুধবার দিন সুস্থ হইয়া গোসল করতঃ কিছু খানা খাইয়া মসজিদে নববীতে হাজির হইয়া নামাজের ইমামতি করিয়াছিলেন। ইহাতে উপস্থিত সাহাবীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। আর খুশীর কারণে অনেকে অনেক দান খয়রাত করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে হজরত আবু বকর (রাঃ) খুশীতে ৭ সহস্র দিনার এবং হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ৫ সহস্র দিনার, হজরত ওসমান (রাঃ) ১০ সহস্র দিনার, হজরত আলী (রাঃ) ৩ সহস্র দিনার এবং হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ১০০ উট ও ১০০ ঘোড়া আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিয়াছিলেন। তৎপর হইতে মুসলমানগণ সাহাবীগণের নীতি অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া আসিতেছে। নবী করীম (সাঃ) এর এ দিনের গোসলই জীবনের শেষ গোসল ছিল। ইহার পর আর তিনি জীবিতকালে গোসল করেন নাই। তাই সকল মুসলমানের জন্য এই দিবসে ওজু গোসল করতঃ ইবাদত বন্দেগী করা উচিত এবং নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি দুরুদ শরীফ পাঠ করতঃ সওয়াব রেছানী করা কর্তব্য’।[৫]

উপরের এই কাহিনীটিই কমবেশি সমাজে প্রচলিত এ বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা রয়েছে। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেও কোনো ছহীহ বা যঈফ হাদীছে এই ঘটনার কোনো প্রকার উল্লেখ পাইনি। হাদীছ তো দূরের কথা, কোনো ইতিহাস বা জীবনীগ্রন্থেও আমি এ ঘটনার কোনো উল্লেখ পাইনি। ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম সমাজে ‘ছফর মাসে শেষ বুধবার’ পালনের রেওয়াজ বা এই কাহিনী প্রচলিত আছে বলে আমার জানা নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ অসুস্থতা : রাসূলুল্লাহ ﷺ ছফর বা রবীউল আউয়াল মাসের কত তারিখ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইন্তেকাল করেন সে বিষয়ে হাদীছে কোনোরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। অগণিত হাদীছে তাঁর অসুস্থতা, অসুস্থতাকালীন অবস্থা, কর্ম, উপদেশ, তাঁর ইন্তেকাল ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনোভাবে কোন দিন, তারিখ বা সময় বলা হয়নি।

তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে অনেক মত প্রচলিত রয়েছে। কেউ বলেছেন, ছফর মাসের শেষ দিকে তাঁর অসুস্থতা শুরু। কেউ বলেছেন, রবীউল আউওয়াল মাসের শুরু থেকে তাঁর অসুস্থতা শুরু। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত তাবেঈ ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক্ব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ যে অসুস্থতায় ইন্তেকাল করেন, সেই অসুস্থতার শুরু হয়েছিল ছফর মাসের শেষ কয়েক রাত থাকতে, অথবা রবীউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে’।[৬]

কয়দিনের অসুস্থতার পরে তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, ১০ দিন। কেউ বলেছেন, ১২ দিন। কেউ বলেছন, ১৩ দিন। কেউ বলেছেন, ১৪ দিন। তিনি কোন তারিখে ইন্তকাল করেছেন সে বিষয়েও মতভেদ

৩. খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া, রাহাতুল কুলূব, পৃ. ১৩৮-১৩৯; মুফতী হাবীব ছামদানী, বার চান্দের ফজীলত, পৃ. ১৪।

৪. রাহাতুল কুলূব, পৃ. ১৩৯।

৫. বার চান্দের ফজীলত, পৃ. ১২।

৬. ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, ৪/২৮৯।

রয়েছে। কেউ বলেছেন, পহেলা রবীউল আউয়াল; কেউ বলেছেন, দোসরা রবীউল আউয়াল আবার কেউ বলেছেন, ১২ই রবীউল আউয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন।

সর্বাবস্থায় কেউ কোনোভাবে বলছেন না যে, অসুস্থতা শুরু হওয়ার পরে মাঝে কোনোদিন তিনি সুস্থ হয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেই, ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে তিনি গোসল করেছিলেন বলে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আমার গৃহে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার উপরে সাত মশক পানি ঢালো, যেন আমি আরাম বোধ করে লোকদের নির্দেশনা দিতে পারি। তখন আমরা এভাবে তাঁর দেহে পানি ঢাললাম। এরপর তিনি মানুষদের নিকট বেরিয়ে যেয়ে তাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করলেন এবং তাদেরকে খুৎবা প্রদান করলেন বা ওয়ায করলেন'।[৭]

এখানে স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুস্থতার মধ্যেই অসুস্থতা ও জ্বরের প্রকোপ কমানোর জন্য এভাবে গোসল করেন, যেন কিছুটা আরাম বোধ করেন এবং মসজিদে যেয়ে সবাইকে প্রয়োজনীয় নছীহত করতে পারেন।

এই গোসল করার ঘটনাটি কত তারিখে বা কী বারে ঘটেছিল তা হাদীছের কোনো বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের অন্যান্য হাদীছের সাথে এই হাদীছের সমন্বয় করে উল্লেখ করেছেন যে, এই গোসলের ঘটনাটি ঘটেছিল ইন্তেকালের আগের বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ ইন্তেকালের পাঁচ দিন আগে।[৮] ১২ই রবীউল আউয়াল ইন্তেকাল হলে তা ঘটেছিল ৮ই রবীউল আউয়াল।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ছফর মাসের শেষ বুধবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুস্থ হওয়া, গোসল করা এবং এ জন্য ছাহাবীগণের আনন্দিত হওয়া ও দান-ছাদাক্বা করার এ সকল কাহিনীর কোনোরূপ ভিত্তি নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

যেহেতু মূল ঘটনার তারিখ নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত নয়, সেহেতু সেই ঘটনা উদযাপন করা বা পালন করার প্রশ্নই উঠে না। এরপরও আমাদের বুঝতে হবে যে, কোনো আনন্দের বা দুঃখের ঘটনায় আনন্দিত ও দুঃখিত হওয়া এককথা, আর প্রতি বছর সেই দিনে আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করা বা 'আনন্দ দিবস' আ 'শোক দিবস' উদযাপন করা সম্পূর্ণ অন্য কথা। উভয়ের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে অনেক আনন্দের দিন বা মুহূর্ত এসেছে, যখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন, শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য আল্লাহর দরবারে সাজদাবনত হয়েছেন। কোনো কোনো ঘটনায় তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণও আনন্দিত হয়েছেন ও বিভিন্নভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পরের বছর বা পরবর্তী কোনো সময়ে সেই দিন বা মুহূর্তকে তারা বাৎসরিক 'আনন্দ দিবস' হিসেবে উদযাপন করেননি। এজন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ বা ছাহাবীদের কর্ম ছাড়া এইরূপ কোনো দিন বা মুহূর্ত পালন করা বা এইগুলোতে বিশেষ ইবাদতকে বিশেষ ছওয়াবের কারণ বলে মনে করার কোনো সুযোগ নেই।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ছফর মাসের শেষ বুধবারের কোনো প্রকার বিশেষত্ব হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এই দিনে ইবাদত-বন্দেগী, ছালাত-ছিয়াম, যিকির-দু'আ, দান-ছাদাক্বা ইত্যাদি পালন করলে অন্য দিনের চেয়ে বেশি বা বিশেষ কোনো ছওয়াব বা বরকত লাভ করা যাবে বলে ধারণা করা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। এমন ভিত্তিহীন বানোয়াট দিনকেন্দ্রিক যেকোনো আমল-ইবাদত স্পষ্ট বিদআত।

মূলত মানুষ শরীআতের অনুসৃত হয়ে যদি পুরো মাস ও বছর নেক আমল বা ভালোকর্ম করে, তখন তার সকল দিন, মাস, বছর সবই মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট ফযীলতপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যময় হয়ে যায়, তখন তাতে অশুভত্ব আর অমঙ্গল ইত্যাদি বলতে কিছুই থাকে না। আর যদি তারা মহান আল্লাহ ও তাঁর দেওয়া বিধান, দ্বীনকে ছেড়ে নিজেদের মনমতো জীবনযাপন করে, তখন দিন, মাস, বছর কেন তার পুরো জীবনটাই অশুভ ও অমঙ্গল হয়ে দাঁড়ায়। বর্বর জাহেলিয়াতের যুগের মতো আজ আমরা মুসলিমরা কুরআনুল কারীম ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বিশুদ্ধ হাদীছ হতে দূরে সরে নিজেদের বিভিন্ন মনগড়া মতবাদ উপস্থিত করে সময় ও মাসকে ফযীলতপূর্ণ বা বৈশিষ্ট্যময় মনে করে এমন সব আমল বা কর্মদিবস উদযাপন করে থাকি, যার বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআনুল কারীম ও বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় না।[৯]

আবার দেখা যায়, অনেকে কোনো কোনো মাস ও সময়কে অশুভ-কুলক্ষণ ধারণা পোষণ করে তাতে বিয়ে-শাদী, আনন্দ-উৎসব, কোনো স্থানে যাওয়া, ভ্রমণ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে, যেমন ধারণা করত জাহেলিয়াত যুগের জাহেলরা। অথচ সময়, মাস সবই মহান আল্লাহর সৃষ্ট, যা মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি সৃষ্টি করেছেন। ওসবে কোনো অশুভ বা কুলক্ষণ হওয়ার বর্ণনা কোথাও নেই। না কুরআনুল কারীমে আর না হাদীছে বরং এ ধরনের ধারণা পোষণ শিরকেরই অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সর্বপ্রকার শিরক ও বিদআত থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

[প্রবন্ধটি 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বই থেকে সংগৃহীত ও পরিমার্জিত।]

৭. ছহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৪৪৪২, ৫৭১৪, ৪০৯৮।

৮. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী, ৮/১৪২।

৯. যদিও অনেকে 'বার চান্দের ফজীলত' নাম দিয়ে বই-পুস্তক লিখেছে, আর তাতে তারা অনির্ভরযোগ্য অনেক কথার অবতারণা করেছে। -লেখক

মাযারে দান-ছাদাক্বা : ইসলাম কী বলে?

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

ভারতীয় উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা মানতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাযারে প্রচুর পরিমাণ দান-ছাদাক্বা করে থাকে। মাযারের এই মানত ও দান করা সম্পর্কে ইসলামী কী বলে? তা আমরা আজ জানার চেষ্টা করব।

মানত কী?

শরীআতের পরিভাষায় মানত হলো নিজের উপর এমন আমল অবধারিত করে নেওয়া, যা তার উপর অবধারিত ছিল না।[১] মানত হচ্ছে আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা কিংবা কারো নিকটে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কোনো দৈহিক ইবাদত বা টাকা-পয়সা, পশু ইত্যাদি দান করার নিয়্যত করা। মোটকথা, নিজেদের বিপদে-আপদে উদ্ধার কিংবা ভবিষ্যৎ কোনো উদ্দেশ্য পূরণ ইত্যাদির জন্য অর্থ-সম্পদ পশু, দান করা কিংবা কোনো ইবাদতের নিয়্যত করাই হচ্ছে সহজ কথায় মানত।

ইসলামে মানতের বিধান :

মানতের বিষয়টি সুদীর্ঘকাল থেকেই পৃথিবীতে প্রচলিত। শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে যেকোনো ইবাদত, দৈহিক ইবাদত বা দান-ছাদাক্বা ইত্যাদি করার ব্যাপারে শর্তহীন মানত করা উত্তম এবং শর্তযুক্ত মানত করা মাকরূহ। উভয় অবস্থায় মানত করলে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

সুতরাং আল্লাহর উদ্দেশ্যে শর্তহীন মানত করা ভালো। আর যেহেতু মানতে সৎ আমল করা নিজের উপর আবশ্যক করে নেওয়া হয়, এজন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে মানত করা সরাসরি শিরক। মানতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদের মানত করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, মানত কোনো কিছুকে ফেরাতে পারে না। তবে মানতের মাধ্যমে কৃপণ ব্যক্তির সম্পদ বের করা হয়।[২] অন্য একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মানত আদম সন্তানকে এমন কিছু এনে দিতে পারে না যা তাক্বদীরে নির্ধারিত নেই অথচ সে যে মানতটি করে তাও আমি তাক্বদীরে নির্ধারিত করে দিয়েছি যাতে এর মাধ্যমে কৃপণের নিকট হতে (অর্থ-সম্পদ) বের করে নিই'।[৩]

উপরিউক্ত হাদীছ থেকে শিক্ষা হচ্ছে, শর্তযুক্ত মানত করা কখনোই সমীচীন নয়। মানতের মাধ্যমে বান্দা একপ্রকার আল্লাহর সাথে বিনিময়ের শর্ত যুক্ত করে দেয়। যেমন— যদি আমার এই লাভ হয়, তাহলে আমি এই টাকাটা দান করব। তাহলে ঐ কাজ না হলে টাকা দান করব না।

মানত কি তাক্বদীর পরিবর্তন করে?

মানুষের তাক্বদীরে কী আছে, কী নেই তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তিনি সৃষ্টির আগেই তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মানতে সন্তান কামনা, বিপদ উদ্ধার, আয় উন্নতি ইত্যাদি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। অথচ এসব কিছু তাক্বদীরে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত আছে। আগের উল্লিখিত হাদীছ অনুযায়ী রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা হচ্ছে মানত কখনোই কারো তাক্বদীর পরিবর্তন করে না।

মাযারে দান কার উপকারে আসে?

সাধারণ মানুষ মাযারে টাকা-পয়সা দিলেও সেই অর্থ কখনোই কবরে শায়িত ব্যক্তির উপকারে আসে না। কেননা কবরে কারোরই অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন নেই। তাই এসব দানের টাকা মূলত মাযার তদারককারীদের উপকারে আসে। তারাই হচ্ছে ঐ টাকার মালিক। তারা সেই টাকার কিছু অংশ বার্ষিক ওরশের আয়োজন করে কিছু মানুষকে খাওয়ায়, কিছু মাযার উন্নয়নে খরচ করে, আর সিংহভাগ টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়!

মানত যখন হারাম বা শিরক :

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে বা অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্য মানত করা সরাসরি শিরক। উপমহাদেশে ছূফীরা

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

১. আল-ফিক্বহুল মুইয়াসসার ফী যওইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ৩৯২।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩৯।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬০৯, ৬৬৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৪০; আহমাদ, হা/৯৩৫১।

যিয়ারত এবং মানতের উদ্দেশ্যে মাযারে গিয়ে থাকে। তারা নিজেদের স্বার্থ লাভের জন্য মানতকে অর্থের মানদণ্ডে রূপান্তরিত করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কবরে শায়িত ওলী-আওলিয়ার দিকে ফিরিয়ে দেয়। যার ফলে সাধারণ মানুষ আল্লাহর জন্য বা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দৈহিক ইবাদত মানত করা ছেড়ে দিয়ে, তাদের কথিত ওলী-আওলিয়ার মাযারে টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ, পশু ইত্যাদি মানত করা শুরু করে। আল্লাহকে ছেড়ে কবরে শায়িত ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানতের কারণে ছূফীরা সুস্পষ্ট শির্কে লিপ্ত হচ্ছে, যা কখনোই ইসলামী শরীআতে জায়েয নেই। আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ‘যখন লুক্বমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহাঅন্যায়’ *(লুক্বমান, ৩১/১৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার গোনাহ ক্ষমা করেন না। এছাড়া যে কোনো পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন’ *(আন-নিসা, ৪/৪৮)*।

সুতরাং সর্বাবস্থায় বান্দাদের একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে; একমাত্র তাঁরই জন্য ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মৃত কবরবাসী পীর, মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়া কখনোই কারো উপকার বা অপকার করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এমন কোনো শিক্ষা নেই যে, মৃত ব্যক্তি কারো কথা শুনে তার উপকার বা অপকার করতে পারে। অতএব, মানতের মাধ্যমে কবরবাসীর জন্য টাকা-পয়সা, পশু ইত্যাদি দান-ছাদাক্বা করা হারাম এবং শিরক।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইসলামে মানত করা গেলেও তা শুধু আল্লাহর নামে, আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানত করতে হবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে, উদ্দেশ্যে বা সন্তুষ্টির জন্য মানত করা যাবে না। সেই সাথে মানতের উদ্দেশ্যে মাযারে দান করা হলেও তা দান হিসাবে গ্রাহ্য হবে না। সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে খুশী করার জন্য অথবা মৃত ব্যক্তিকে অসীলা হিসেবে গ্রহণ করে মাযারে মানত করা কখনোই ইসলামসম্মত নয়। বরং এটি সুস্পষ্ট শিরক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

বন্ধ্যাত্ব, ব্যথা, ক্যান্সার
পাইল্‌স, পাথুরি, আইবিএস, টিউমার এবং অন্যান্য জটিল রোগীর চিকিৎসা সেবা
হোমিও মেডিসিন ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মোঃ রুহুল আমিন সরকার
বি.এইচ.এম.এস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), এম.পি.এইচ (পুদ্রু বিশ্ববিদ্যালয়), ডি.এম.ইউ (বি.টি.ই.বি, ঢাকা)
সি.সি.পি (বি.এন.এম.সি, ঢাকা), সি.এ.এম (বি.ইউ.এ.বি, ঢাকা), উচ্চতর প্রশিক্ষণ (ভারত)
সহযোগী অধ্যাপক, রংপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, রংপুর
প্রাক্তন হাউজ ফিজিশিয়ান, গভ. হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা
রংপুর চেম্বারঃ রুহুল হোমিও সেন্টার
পি.বি রোড, জাহাজ কোম্পানী মোড়, রংপুর। সময়ঃ বিকাল ৩.০০টা হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত (রবি থেকে বৃহস্পতিবার)
গাইবান্ধা চেম্বারঃ রাইয়ান হোমিও সেন্টার
বড় মসজিদের সামনে, পুরাতন বাজার, গাইবান্ধা। সময়ঃ বিকাল ৩.০০টা হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত, (প্রতি শনিবার)
সিরিয়ালঃ 01767 222 000

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের একাল-সেকাল

-মো. হাসিম আলী*

সাধারণ অর্থে যিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন তিনি ছাত্র এবং যিনি শিক্ষাদান করেন তিনি শিক্ষক। আর তাদের মধ্যকার সম্পর্কই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক হচ্ছে অতি পবিত্র, আত্মিক, মধুর ও অবিচ্ছেদ্য, যার মূলভিত্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

'শিক্ষা'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক। তাই ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা সম্পর্কে জানা। বাংলায় 'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশ দান করা, উপদেশ দান করা। সাধারণভাবে বিদ্যা অর্জন, বিদ্যা আহরণ অর্থেও 'শিক্ষা' শব্দটির ব্যবহার হয়। এ 'বিদ্যা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে, যার অর্থ জানা বা জ্ঞান আহরণ করা। 'শিক্ষা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Education। এটি ল্যাটিন শব্দ। ল্যাটিন ভাষায় Education সংক্রান্ত তিনটি মৌলিক শব্দ পাওয়া যায়, যথা— Educare, Educere, Educatum। শব্দগুলো সমার্থক হলেও এগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমত, Educare অর্থ লালনপালন করা, পরিচর্যা করা। অর্থাৎ শিশুকে আদর-যত্নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। দ্বিতীয়ত, Educere অর্থ ভেতর থেকে বাইরে আনা বা অন্তর্নিহিত শক্তি বা গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা। তৃতীয়ত, Educatum অর্থ শিক্ষক বা শিক্ষাদান সংক্রান্ত। এ তিনটি শব্দের মধ্যে Educere শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই 'শিক্ষা'র ক্ষেত্রে Educere শব্দটি গ্রহণ করে আমরা বলতে পারি, 'যা অন্তর্নিহিত গুণাবলি ও শক্তি সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায় তা-ই শিক্ষা'। অন্যকথায়, ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হলো শিক্ষা। সুতরাং 'শিক্ষা' বলতে যদি সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও ডিগ্রিকে বুঝি, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বলতে দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক বুঝি, তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয় না।

শিক্ষার সাথে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং যথার্থ ছাত্র ও শিক্ষকের পরিচয়ও তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছাত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Student। এ শব্দটির প্রতিটি অক্ষর থেকে আলাদা আলাদা যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পেতে পারি, তা এরকম হতে পারে— S=Study (অধ্যয়ন), T=Truthfulness (সত্যবাদিতা), U=Unity (ঐক্য), D=Discipline (শৃঙ্খলা), E=Eagerness (আগ্রহ), N=Neutrality (নিরপেক্ষতা), T=Time bound (সময়নিষ্ঠ)। একজন ছাত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ)-এর শিক্ষক আল্লামা ওয়াকী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ছাত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো সকল পাপকাজ বর্জন করা'। সুতরাং বলা যায়, যিনি নিয়মিত অধ্যয়ন করেন, সত্যের আলোতে নিজেকে উদ্ভাসিত করেন, ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করেন, শেখার প্রতি যিনি আগ্রহী ও যত্নশীল থেকে প্রতিটি কর্তব্য যথাসময়ে সম্পাদন করেন, তিনিই ছাত্র। আর শিক্ষকতার মতো একটি মহান পেশায় যিনি জড়িত, তিনিই শিক্ষক। শিক্ষক শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ— Teacher। শব্দটি খুবই বিশ্লেষণধর্মী, যার মাধ্যমে একজন শিক্ষক উপলব্ধি করতে পারবেন তার স্বরূপ ও দায়িত্ব। আবার শিক্ষার্থীও উপলব্ধি করতে পারবেন তার প্রিয় শিক্ষকের প্রতিচ্ছবি। একজন শিক্ষককে সবসময় মনে রাখতে হবে যে, তিনি কে? তাঁর দায়িত্ব কী? তাকে অবশ্যই শিক্ষক শব্দের মধ্যে লুক্কায়িত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। একজন ব্যক্তিকে যথার্থ অর্থে শিক্ষক হতে গেলে 'শিক্ষক' শব্দের 'শি' দ্বারা 'শিক্ষণ', 'শিক্ষা', 'ক্ষ' দ্বারা 'ক্ষমা', 'ক্ষমতা', 'ক' দ্বারা কর্মঠ, কৌশলী ইত্যাদি গুণ অর্জন করতে হয়।

মোটকথা, শিক্ষক হতে গেলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম বিষয়গত জ্ঞানে অগাধ ক্ষমতাধর হওয়ার পাশাপাশি ছাত্রের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে কৌশলী ও কৌতূহলী হতে হবে। ছাত্রকে স্নেহের শাসনের পাশাপাশি তার প্রতি ক্ষমাশীল ও মহানুভবও হতে হবে। Teacher শব্দটির মাঝে লুকিয়ে থাকা অসংখ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে যা ছাত্র-শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক তৈরিতে সহায়ক হবে। যেমন— Talented (প্রতিভাধর), Tacful (কৌশলী), Trained (প্রশিক্ষিত), Truthful (সত্যবাদি)। E=Expert (দক্ষ), Earnest

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

(আন্তরিক), Energetic (উদ্যমশীল)। A=Aesthetic (রুচিশীল), Active (কর্মঠ), Artist (শিল্পী), Administrator (প্রশাসক)। C=Careful (যত্নশীল), Competent (যোগ্য), Creative (সৃজনশীল), Cheerful (উৎফুল্ল)। H=Honest (সৎ), Humorist (রসিক), Helper (সাহায্যকারী), Healthy (স্বাস্থ্যবান)। E=Evaluator (মূল্যায়ক), Eloquent (বাকপটু), Editor (সম্পাদক), Emotional (আবেগদীপ্ত)। R=Reader (পাঠক), Reliable (নির্ভরযোগ্য), Responsible (দায়িত্বশীল), Researcher (গবেষক)।

ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। এটি পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। পিতা-মাতা সন্তানকে জন্মদান করেন। তাকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন একজন শিক্ষক। তাইতো কবি বলেছেন—

"সকলের মোরা নয়ন ফুটাই, আলো জ্বালি সব প্রাণে
নব নব পথ চলিতে শেখাই জীবনের সন্ধানে।
পরের ছেলেরে এমনি করিয়া শেষে
ফিরাইয়া দেই পরকে আবার অকাতরে নিঃশেষে।"

পুত্র পিতা থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হন। আর ছাত্র শিক্ষক থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হন। তাঁদের সম্পর্ক ভালোবাসা, স্নেহের, বন্ধুত্বের, আস্থার ও বিশ্বাসের সম্পর্ক। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ছাহাবীগণ ছিলেন তাঁর ছাত্র। তিনি ছাহাবীদের নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। ছাহাবীগণও তাকে ভালোবাসতেন পৃথিবীর যেকোনো কিছুর তুলনায় অনেক বেশি। এমনকি ছাহাবীগণ মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উঁচুস্বরে কথাও বলতেন না। একজন শিক্ষার্থীর অনেক প্রত্যাশা থাকে শিক্ষকের নিকট। সে প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যমে শিক্ষক স্থায়ী আসন লাভ করেন ছাত্রের হৃদয়ের ভেতরে। এজন্য শিক্ষককে আজীবন ছাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ছাত্র-শিক্ষক পরস্পর পরস্পরের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করে থাকেন। ছাত্র যত বড়ই হোন না কেন তাঁর জীবনে শিক্ষকের অবদান কোনো দিন অস্বীকার করতে পারেন না। আবার ছাত্রকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কেউ মহান শিক্ষকও হতে পারেন না। কারণ ছাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে শিক্ষকের সকল যোগ্যতা ও প্রচেষ্টা মূল্যহীন। বর্তমানে নৈতিক অবক্ষয় ও মানবিক বিপর্জয় এমন পর্যায়ে পৌঁছছে যে, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক আজ টিউশনি, পরীক্ষায় পাশ আর ডিগ্রি লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পথে-ঘাটে দেখা হলে সালাম কিংবা কুশল বিনিময় তো হয়ই না; বরং পরস্পর অপরিচিতের মতো আচরণ করে থাকে। ছাত্রের হাতে আজ বই-খাতা-কলমের পরিবর্তে শোভা পাচ্ছে মারণাস্ত্র ও মাদক। ফলে প্রতিনিয়ত শিক্ষকের খুনে ছাত্রের হাত রঞ্জিত হচ্ছে। আজকের এ অবস্থার জন্য শুধু ছাত্ররা দায়ী নন। এজন্য শিক্ষকসমাজের সে অংশও দায়ী, যারা শিক্ষকতাকে নিছক টাকা কামানোর উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে, যাদের নীতি আর চরিত্র বলতে কিছু নেই। যারা শিক্ষকতার মহান পেশায় থেকেও ধূমপান, মাদক, অশ্লীলতা, অবৈধ নারী সম্ভোগে ডুবে থাকেন সারাক্ষণ, যারা শ্রেণিকক্ষে পাঠদান অপেক্ষা দলবাজি আর টিউশনিতে আনন্দ বেশি পান। দু'পয়সা কামানোর ধান্দায় নীতি-নৈতিকতার মাথা খেয়ে ছাত্রদের সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেন। ছাত্রকে নিজের সন্তানের মতো ভাবতে পারেন না, একটু স্নেহ করতে পারেন না। তার মধ্যে লুক্কায়িত অপার সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতে পারেন না।

আবার এ দুরবস্থার জন্য সেই অভিভাবকও কম দায়ী নন, যিনি সন্তানকে স্নেহের শাসনের পরিবর্তে আশকারা দেন। যিনি সন্তানকে নৈতিক শিক্ষাদানের চেষ্টাও করেন না। যিনি নিজেই উশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। যিনি সন্তানকে শাসনের পরিবর্তে শিক্ষককে শাসন করতে প্রয়াস পান। যিনি লোকমান আলাইহিস সালাম-এর মতো উপদেশ সন্তানকে দিতে পারেন না। যিনি প্রাইমারি স্কুলগামী সন্তানকে দামী মোবাইল কিনে দেন আধুনিক ও স্মার্ট হওয়ার জন্য, তিনিও কম দায়ী নন। আবার এ পরিণতির দায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের ঘাড়ে দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র চুপ থাকতে পারে না। সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের স্বাধীনভাবে বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপাশি নৈতিকতার চর্চা করতে হবে সমাজের তৃণমূল থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত। অনৈতিকতার সকল পথ রুদ্ধ করতে হবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে। ছাত্রদের রাজনীতির বিষবাষ্প থেকে দূরে রাখতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁর মাধ্যমে ঘটে একজন ছাত্রের সত্যিকারের বৃদ্ধি, বিকাশ, ও প্রতিষ্ঠা। আবার ছাত্রই শিক্ষক মূল্যায়নের প্রকৃত উপাদান। সুতরাং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এমন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে, যেখানে থাকবে শুধু পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আস্থা আর কল্যাণচিন্তা।

আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান : মর্যাদা, ফযীলত ও ফলাফল

-অনুবাদ : শায়খ মাহবূবুর রহমান মাদানী

*[১১ যুলক্বা'দাহ, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ১০ জুন, ২০২২। মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ আব্দুল মুহসিন ইবনু মুহাম্মাদ আল-ক্বাসেম** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক **শায়খ মাহবূবুর রহমান মাদানী**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য ও ক্ষমা চাই। আর তাঁর কাছে আমাদের আত্মার অনিষ্ট হতে এবং খারাপ আমল থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে হেদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের উপর।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো। আর একান্ত সংলাপ ও গোপন বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো।

হে মুসলিম সম্প্রদায়! আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানের মহান মর্যাদা রয়েছে। ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হলো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও দ্বীন সম্পর্কে ইয়াক্বীন তৈরি হওয়া; যা অর্জিত হয় মর্মমূলে গভীর ইলমের মাধ্যমে, যাকে কোনো সন্দেহ-সংশয় দুর্বল করতে পারে না এবং কোনো ফিতনা তাতে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না।

ঈমানে ইয়াক্বীনের স্থান হলো দেহে প্রাণের ন্যায়। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সম্পূর্ণ ঈমানই হচ্ছে ইয়াক্বীন। আর প্রথম ইয়াক্বীন হলো প্রভু সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস। যেমন আল্লাহর সকল রাসূল তাঁদের স্ব স্ব জাতিকে বলেছিলেন, ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ 'আল্লাহ সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ আছে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা?' *(ইবরাহীম, ১৪/১০)*। অর্থাৎ তোমরা জানো ও স্বীকার করে থাকো যে, আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্বে কোনো সন্দেহ নেই।

মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে উন্নত মানুষ হলো, দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারীগণ। মহান আল্লাহ যখন তাঁর বন্ধু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর শক্তিশালী ঈমান থাকা সত্ত্বেও তাঁর ঈমান আরো বাড়িয়ে দিতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব দেখান, যাতে তিনি সেই সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ 'এভাবে আমি ইবরাহীমকে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব দেখিয়েছি যাতে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন' *(আল-আনআম, ৬/৭৫)*। ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'অর্থাৎ এসব সৃষ্টিতে তাঁর দৃষ্টিদানের মাধ্যমে তাঁর কাছে এই প্রমাণ স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, রাজত্ব ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি একক এবং তিনি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ ও প্রতিপালক নেই'।

দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ইবাদত করা বান্দার মর্যাদা উঁচু করে দেয়, যদিও ইবাদত কম হয়। বকর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুযানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথীদের থেকে অগ্রগামী হয়েছেন বেশি ছালাত ও ছিয়ামের দ্বারা নয় বরং অগ্রগামী হয়েছিলেন এক গুরুগম্ভীর জিনিসের মাধ্যমে; যা তাঁর অন্তরে সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল হয়েছিল'।

পৃথিবীর মাঝে দৃঢ় বিশ্বাসীদেরকে মহান আল্লাহ হেদায়াত ও সফলতার দ্বারা নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ - أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 'আর তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতিও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম' *(আল-বাক্বারা, ২/৪-৫)*। তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলি ও প্রমাণাদীর মাঝে

চিন্তা ও দৃষ্টি দিয়ে উপকৃত হন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ ‘নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে আছে নিদর্শন’ *(আয-যারিয়াত, ৫১/২০)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ঈমান হলো ইসলামের হৃদয় ও সারাংশ। আর ইয়াক্বীন বা দৃঢ় বিশ্বাস হলো ঈমানের হৃদয় ও তার সারাংশ।

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে চেনা ও তাঁকে স্বীকারোক্তির উপর। তাঁর প্রতিপালনই তাঁর উপাস্য হওয়াকে আবশ্যিক করে দেয়। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর তাওহীদকে চেনার ও তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করা ও তাঁকে মা‘বূদ বলে মেনে নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ ‘কাজেই দ্বীনের প্রতি তোমার মুখমণ্ডল নিবদ্ধ করো একনিষ্ঠভাবে। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টি কার্যে কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না’ *(আর-রূম, ৩০/৩০)*।

তাঁর একত্বের উপর প্রমাণ করে এমন সব নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ‘বলো, তোমরা দেখো, কী কী রয়েছে, আসমানসমূহ ও যমীনে’ *(ইউনুস, ১০/১০১)*।

আল্লাহ তাআলাকে চেনার পথসমূহ : আল্লাহকে চেনা, তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ এবং তিনি ইবাদত পাওয়ার হক্বদার হওয়া প্রভৃতি জানার অসংখ্য পথ রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁর নিদর্শন রয়েছে। পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, প্রতিটি বস্তু তার অস্তিত্ব ও একত্বের উপর প্রমাণ বহন করে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ ‘তিনি নিদর্শনাবলীকে বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে পার’ *(আর-রা‘দ, ১৩/০২)*। তাঁর অস্তিত্বের ওপর সবচেয়ে বড় দলীল হলো, তাঁর সৃষ্টিজীব। পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হলেন তিনি। কারণ মানব জ্ঞান ও প্রকৃতিতে এটি স্থিরিকৃত বিষয় যে, কোনো সৃষ্টিজীব নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না এবং এখানে স্রষ্টা ছাড়া কোনো সৃষ্টি নেই। আল্লাহ বলেন, ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ - أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ﴾ ‘তারা কি কোনো কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না-কি তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা? না-কি তারা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী নয়’ *(আত-তূর, ৫২/৩৫-৩৬)*।

চতুষ্পদ প্রাণীগুলো দুর্লভ ও বিস্ময়কর প্রকার ও প্রজাতীর হয়ে থাকে, এসবের গোশত খেয়ে মানুষ পরিতৃপ্ত হয়, এদের পিঠে আরোহন করে এবং এর মাধ্যমে মানুষ অভাবমুক্ত হয়। আল্লাহ বলেন, ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ‘আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কতকের ওপর আরোহন করতে পার, আর কতকগুলো থেকে আহার করতে পার’ *(আল-মুমিন, ৪০/৭৯)*। এগুলো দৃষ্টিপাতকারীকে আনন্দিত ও প্রফুল্ল করে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ ‘আর এসবে রয়েছে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য; যখন তোমরা সন্ধ্যাবেলা সেগুলোকে বাড়ির পানে নিয়ে আসো আর সকালবেলা চারণভূমিতে নিয়ে যাও’ *(আন-নাহল, ১৬/৬)*।

সমুদ্রের মধ্যে অনেক বিস্ময়কর জিনিস রয়েছে। এটি বিভিন্ন জীবনোপকরণ, ধন-ভাণ্ডার, মণি ও মতি-মুক্তায় ভরপুর। সমুদ্রের উপর দিয়ে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় পণ্য বোঝাই নৌযান চলাচল করে। সবদিক থেকে ঢেউ তাকে আঘাত করে। মনে হয় উহা সুউচ্চ পহাড়ের ন্যায়। উহা দেখে দর্শক আল্লাহর একত্বের ঘোষণা করে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ‘তোমরা দেখতে পাও নৌযানগুলো ঢেউয়ের বুক চিরে চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ খোঁজ করতে পার, আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর’ *(আল-ফাত্বির, ৩৫/১২)*।

আল্লাহ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো তাঁর শারীআত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, যা তিনি যথাযথ বিধি-বিদ্ধ করেছেন, নাবীদের জীবন-চরিত আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়ে ইয়াক্বীন বৃদ্ধি করবে।

আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে অটল থাকার উপায়সমূহ : আল্লাহর আনুগত্যে লেগে থাকা, ইবাদত বেশি বেশি করা, নেক ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভ করা, পাপকাজ বর্জন করা, গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা, উপকারী জ্ঞান শিক্ষা করা,

আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাবলিতে চিন্তা-ভাবনা করা এবং নিজের ও সৃষ্টিজগতের মাঝে উহার প্রভাব লক্ষ করা। আর এসব কিছুর সমষ্টি হলো, অধিকহারে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা ও তদনুযায়ী আমল করা এবং সর্বদা মহান আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী হওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে যাবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ 'আমার এ পাদুকা জোড়া নিয়ে যাও এবং বাগানের বাইরে যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হবে, যে আন্তরিকভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মা'বূদ নেই, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিবে'।[১]

হে মুসলিম জাতি! রব সত্য, এ ব্যাপরে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর নাম হক্ব বা সত্য, আর হক্ব হলো তাঁর গুণ। প্রামাণিকতার দিকদিয়ে তাঁর অস্তিত্বই সবচেয়ে বড় বাস্তব সত্য বিষয়। আল্লাহ বলেন, ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ 'এটি এজন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনিই সত্য আর তাঁকে বাদ দিয়ে তারা অন্য যাকে ডাকে তা বাতিল আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সুউচ্চ, বড়' *(আল-হজ্জ, ২২/৬২)*।

মূল ঈমানসহ ইয়াক্বীন হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অন্যতম একটি শর্ত। সন্দেহ-দ্বিধার সাথে ঈমান থাকে না। ইয়াক্বীনের ক্ষেত্রে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে। ইয়াক্বীন বৃদ্ধি ও সুদৃঢ়করণের প্রয়োজনীয়তায় সবসময় জোর দেওয়া হয়েছে। যখন মুমিন ব্যক্তি ইয়াক্বীনে দুর্বলতা অনুভব করবে, তখনই সে শঙ্কিত হয়ে দ্রুত ধাবিত হবে সেসব জিনিসের দিকে; যা তার ইয়াক্বীনকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করবে। এভাবে সে ঈমানের সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে যায়। এরপর খত্বীব সাহেব নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে খুৎবা শেষ করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ 'নিশ্চয় এটা সুনিশ্চত সত্য। কাজেই তুমি তোমার মহান রবের গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করো' *(আল-ওয়াক্বিআ, ৫৬/৯৫-৯৬)*।

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্তে, তাঁর দেওয়া অনুগ্রহের জন্য, তাঁর দান ও তাওফীক্বের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা। আর তাঁর মর্যাদার বড়ত্ব প্রকাশের জন্য আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। অসংখ্য দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি এবং তাঁর পরিবার ও তাঁর ছাহাবীদর প্রতি।

হে মুসলিমগণ! মূল ঈমান স্থির থাকবে না এবং ফল দেবে না, যদি ঈমানদার ব্যক্তি তার পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে যত্ন না নেয়। আর সে প্রকৃত ঈমানে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না তার থেকে সন্দেহ-সংশয় দূর না হবে।

এরপর সম্মানিত খত্বীব রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার, চার খালীফা ও ছাহাবীদের উপর দরূদ এবং সালাম পাঠের পর নিজেদের ও সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য দু'আ করে খুৎবা শেষ করেন।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৩১।

আল-কুরআন : আঁধারের মাঝে এক দীপ্তি

-সাব্বির আহমাদ

আল-কুরআন। সেই হেরা গুহায় মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর নাযিল হওয়া এক আলোকরশ্মি। হেরার এ আলোকরশ্মি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন জনসম্মুখে। তারপর এ রশ্মি আলোকিত করল সবাইকে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে চারদিক থেকে দলে দলে মানুষ প্রবেশ করতে লাগল একত্বের বলয়ে। এ যেন দিশেহারা পথিকের দিশা আর তীরহারা নাবিকের তীর। এ যেন আঁধারের মাঝে এক দীপ্তি। মেঘের কোলে উঁকি মারা একটুখানি রোদ। বাহারি রকম সমস্যা-সমাধানের সমাহার। মানুষের জন্য এক ঝুলি হেদায়াত। সত্য-মিথ্যার মাঝে প্রভেদ করার এক অনন্য উপকরণ।

যার কাছে গেলে খুঁজে পাব জীবনের ছন্দ। যার ছোঁয়া পেলে জ্বলে উঠতে পারে নিভু নিভু হওয়া জীবন-প্রদীপ। জীবন যখন রাতের ঘনঘোর তমসায় ভ্রান্তির মায়াজালে আটকে পড়ে, তখন সেই মায়াজাল ভেদ করে সে তার প্রদীপ জ্বালিয়ে জীবন তরিটিকে কূলে ফিরে আনতে পারে। জীবন-সাগরে যখন উথালপাতাল তরঙ্গের মাঝে হারিয়ে ফেলব কিনারা, তখন সে এনে দিতে পারে সমুদ্রতট। জীবনকে রাঙিয়ে দিতে পারে নতুন ভোরের সোনারাঙা রোদে।

ফুযাইল ইবনু আয়ায। প্রখ্যাত একজন তাবেঈ। যিনি কিনা অতিশয় পাপী এবং সাংঘাতিক রকমের একজন ডাকাত ছিলেন। তিনি পড়শির এক রূপবতী মেয়েকে ভালোবাসতেন। এক রাতে ওই মেয়ের বাড়িতে ঢোকার জন্য দেওয়াল টপকাতে যাবেন, ওমনি কোথা থেকে যেন তার কানে একটি সুমধুর সুর ভেসে আসে। সেই সুর, সেই লহরি পাগলপারা করে দেয় ফুযাইলের মন। হৃদয়-কাননে বয়ে দেয় খুশির কল্লোল। ঘুরিয়ে দেয় তার জীবনের মোড়।

আমেরিকায় একটা কনফারেন্স হয়েছিল। সেখানে প্রতিটা ধর্মগ্রন্থের ১০ মিনিটের আবৃত্তি শোনাতে হবে। ওখানে গিয়েছে গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক, বেদ, রামায়ণ, তিখানিকায়া, টালমার্ডসহ পবিত্র আল-কুরআনও। উদ্দেশ্য হলো, কোন গ্রন্থের আবৃত্তি বেশি সুমধুর লাগে? সব ধর্মগ্রন্থের গুরুরা/ক্বারীরা নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করেছে। বিচারকের সম্মুখে দুটো বাটন আছে। একটা গ্রিন বাটন আরেকটা রেড বাটন। গ্রিন বাটনে চাপ দিলে আবৃত্তি আরম্ভ হলো গীতা, সে ১০ মিনিট আবৃত্তি করে চলে গেল। তারপর ডাকা হলো ত্রিপিটক, সে ১০ মিনিট আবৃত্তি করে চলে গেল। এবার ডাকা হলো ভেটিকেন সিটির ধর্মগুরুকে তার বাইবেল আবৃত্তি করার জন্য, সেও রীতিমতো ১০ মিনিট আবৃত্তি করে চলে গেল। এভাবে একে একে শেষ হলো সকলের আবৃত্তি।

সবশেষে মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন আবৃত্তির জন্য ঘোষণা করা হলো মিশরের ক্বারী আব্দুল বাসেতে ইবনে আব্দুছ ছামাদের নাম। সরু একটা চাদর আর জুব্বা গায়ে মাইকের সামনে এসে أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ বলে একটা টান দিলেন। তিনি সূরা ফাতেহা পড়তেই সময় নিয়েছিলেন ১৩ মিনিট। কিন্তু বিচারক রেড বাটন চাপে না। এই ফুরসতে তিনি সূরা আর-রহমান তেলাওয়াত শুরু করলেন।

১৫ মিনিট হয়ে যায় ২০, ২৫, ৩০ মিনিট হয়ে যায়। কিন্তু বিচারক রেড বাটন চাপে না। এদিকে অর্গানাইজিং কমিটির প্রধান চেয়ার থেকে উঠে এসে বিচারককে ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগল, What are you doing in here? What's wrong with you? Why aren't you pressing the red batton? ওনাকে দেখেই বিচারক ভূত দেখার মতো ঝলকানি দিয়ে উঠলেন। কিহ! রেড বাটন! তিনি আবার যখন আব্দুল বাসেতের তেলাওয়াতের দিকে দৃষ্টিপাত করে আবার তন্ময় হয়ে যান।

কোন সে জিয়নকাঠি? যার অনুপম স্পর্শে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল ফুযাইলের মৃত অন্তর। বদলে গিয়েছিল তার জীবন। যার অমীয় সুধায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল কনফারেন্সের সেই বিচারকের অন্তর। হৃদয়ের অন্দরমহলে শুরু হয়েছিল মহাসাইক্লোন। যার তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল জিনদের সেই দল। সেটা হলো আল-কুরআন।

তোমার মনে কি একবারও অদম্য কৌতূহল জাগে না? একটুও কি ইচ্ছে করে না, কী আছে এই বইয়ে? যেটা ফুযাইলের জীবনে বসন্ত এনে দিয়েছিল। জিনদের সেই দলকে ইসলামের সুধা পান করিয়েছিল। হতবাক করে দিয়েছিল কনফারেন্সের সেই বিচারককে। তাহলে, চলো! আজ তবে খুলে দেখা যাক সেই মহাগ্রন্থ...।

* অধ্যয়নরত, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইন্সটিটিউট, উত্তরা, ঢাকা।

হঠাৎ লোডশেডিং ভয়াবহভাবে বেড়ে গেল কেন?

*-জুয়েল রানা**

দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি কমাতে গত ১৯ জুলাই থেকে চলছে শিডিউল করে এলাকাভিত্তিক লোডশেডিং। প্রতিদিনই রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দফায় দফায় লোডশেডিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে লোডশেডিং আরও তীব্র। অনেক এলাকায় দিনে ৭-৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ-বিভ্রাট হচ্ছে।

সরকার সারা দেশে প্রতি এলাকায় দিনে এক ঘণ্টা করে লোডশেডিং-এর কথা বললেও বাস্তবে কোথাও কোথাও দিনে ৯ ঘণ্টাও হচ্ছে। লোডশেডিংয়ের নতুন যে শিডিউল দেওয়া হয়েছে, তাতে কোথাও দিনে তিন ঘণ্টার কম লোডশেডিং নেই।

২০১২ সালে জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদ্যুতের উৎপাদন ঘাটতি মোকাবিলায় দিনে ২ ঘণ্টা করে লোডশেডিং করার নির্দেশ দেন। এর আগে লোডশেডিংয়ের সুনির্দিষ্ট কোনো সময় ছিল না। ২০১৮ সালে সরকার ঘোষণা করে, দেশে উৎপাদন পর্যায়ে কোনো লোডশেডিং নেই। যেটুকু আছে, সেটা বিতরণ সমস্যা ও সিস্টেম লসের কারণে হয়ে থাকে।

হঠাৎ করেই বিদ্যুতের লোডশেডিং ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে। কেন বিদ্যুতের এত ঘাটতি দেখা দিল? বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো কেন চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে না? এর উত্তরে সরকার থেকে জ্বালানি সংকট, বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়া, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আসা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে। তবে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপর অধিক নির্ভরতা, লোডশেডিংয়ে রেশনিংয়ে সমন্বয়হীনতার কারণে পরিস্থিতি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (বিপিডিবি) তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৫২ শতাংশ বিদ্যুৎকেন্দ্র গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। আর জ্বালানি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোটগ্যাসের ৭০ ভাগই বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

বিদ্যুৎ সংকটের কারণে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে স্ট্যাটাস দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু। এক পোস্টে তিনি বলেছেন, ‘গ্যাস স্বল্পতার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এতে অনেক জায়গাতেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন পুনরায় স্বাভাবিক হবে। যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির উচ্চমূল্য ও সরবরাহ অন্যান্য সব দেশের মতো আমাদেরও সমস্যায় ফেলেছে। এ পরিস্থিতিতে আপনাদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি’।

রাশিয়া জানিয়েছে, পাইপলাইন দিয়ে ইউরোপে গ্যাসের সরবরাহ অনেক কমিয়ে দেবে তারা। স্বাভাবিক সরবরাহের মাত্র ২০ শতাংশ গ্যাস আসবে। আতঙ্কিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন ব্রাসেলসে জরুরী এক বৈঠকে সদস্য দেশগুলোতে আগামী সাত মাস গ্যাসের ব্যবহার কমপক্ষে ১৫ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ইইউ জোটের সাথে মস্কোর সম্পর্ক এখন তলানিতে। প্রতিশোধ নিতে শীতের আগে রাশিয়া গ্যাস দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারে বলে ইউরোপে গভীর আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

গত আড়াই বছরে করোনার ধকল কাটতে না কাটতেই এবার লোডশেডিংয়ের কবলে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। জ্বালানি সংকটের কারণ দেখিয়ে সারা দেশেই লোডশেডিং দিচ্ছে সরকার। ফলে দিনের বেলায় ক্লাসে গিয়েও গরমের কারণে পড়াশোনা করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে সন্ধ্যার পরও কয়েক দফায় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে ঘরে বসেও ঠিকমতো পড়াশোনায় মন বসাতে পারেছে না তারা। ফলে করোনায় শিক্ষায় যে ক্ষতি হয়েছিল তা সহসা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া গত কয়েক দিনের

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

তীব্র তাপদাহে অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তারা স্কুলে গিয়েও প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। শিক্ষকগণ ক্লাসে গিয়েও লোডশেডিংয়ের কারণে ঠিকমতো নিয়মিত পাঠ কার্যক্রম চালাতে পারছেন না।

শুধু স্কুলের ক্লাসরুমেই নয়, বরং বাসাবাড়িতেও সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, গভীর রাতেও বিদ্যুতের লুকোচুরি চলছে। সবচেয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে সন্ধ্যার পরে বিদ্যুৎ চলে গেলে। সারা দেশে প্রত্যেক গ্রাম কিংবা শহরই শুধু নয়; প্রতিটি পরিবারের শিক্ষার্থী সন্তানরাই সন্ধ্যার পরে পড়তে বসে। কিন্তু গত কয়েক দিনের প্রাত্যহিক রুটিনে দেখা গেছে সেখানেও বিভ্রান্তি ঘটছে। সন্ধ্যার পরে বিদ্যুৎ না থাকলে অনেক পরিবারের ছেলে-মেয়েরাই আর বিকল্প আলোতে পড়তে পারছে না। নিয়মিতভাবে এভাবে বিদ্যুতের বিভ্রাট চলতে থাকলে নিশ্চিতভাবেই তারা পড়াশোনায় আরো পিছিয়ে পড়বে।

ভরা মৌসুমে সারা দেশের মতো চায়ের রাজধানী খ্যাত মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে অব্যাহত লোডশেডিংয়ের কারণে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে চা শিল্প। এতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও গুণগত মান নিয়ে দেখা দিয়েছে শঙ্কা। যার প্রভাব পড়বে আগামী রফতানি বাজারে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে লোডশেডিং শিডিউল চালু হওয়ায় এই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে দেশের অন্যতম অর্থকরী ও রফতানিযোগ্য ফসল চা।

হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারে অনেক সময় অর্ধেক অপারেশন করে বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে এবং চিকিৎসকদের জেনারেটরের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আবার কিছু কিছু মেশিন জেনারেটর দিয়ে চালানোও সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া এক্স-রে ও প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টও ঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি মোকাবেলায় রেশনিং শুরু করেছে সরকার। চাহিদার চেয়ে দেড় হাজার মেগাওয়াট কম বিদ্যুৎ নিয়ে এলাকাভিত্তিক এক ঘণ্টার লোডশেডিং দিয়ে এটা শুরু হয়েছে। কিন্তু তাতে কি পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে? বিশ্লেষকরা বলছেন, এতে হয়তো সাময়িক উপশম হবে। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিতে হলে কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে যেতে হবে। আর সেটা সম্ভব গ্যাস ও কয়লা দিয়ে। তবে এই খাতে লুটপাট বন্ধ না হলে কিছুতেই কিছু হবে না।

সরকার বিদ্যুতের রেশনিং-এর সাথে সাথে ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোও বন্ধ করে দিয়েছে । তাতে আরো এক হাজার ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হবে। সব মিলিয়ে দেশে পিক আওয়ারে বিদ্যুতের চাহিদা আছে ১৪ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। পাওয়া যাচ্ছে ১৩ হাজার মেগাওয়াট। ঘাটতি আছে এক হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। এই ঘাটতি মেকাবেলা করতেই এখন এলাকাভিত্তিক প্রতিদিন গড়ে এক ঘণ্টা করে লোডশেডিং করা হচ্ছে। এতে প্রায় এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কম লাগবে বলে সরকার বলছে। তবে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. শামসুল আলম মনে করেন, 'বিদ্যুৎ উৎপাদনের হিসেবে ফাঁকি আছে। পিক আওয়ারে যদি শপিংমলসহ দোকানপাট বন্ধ রাখা হয় তাহলে খুব সামান্যই লোডশেডিং হওয়ার কথা, এক ঘণ্টা নয়। বাস্তবে গ্রামে আগে থেকেই লোডশেডিং আছে। এখন এক ঘণ্টা নয় আরো বেড়েছে।

সেই সাথে সরকার বিদ্যুৎ সাশ্রয় করার জন্য রাত আটটার পর শপিংমল, দোকানপাট বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। অফিস সময়ও পরিবর্তন হতে পারে। সব দাপ্তরিক মিটিং ভার্চুয়ালি করার জন্য বলেছে। ছালাত ও প্রার্থনার সময় ছাড়া মসজিদ ও উপাসনালয়ে এসি বন্ধ রাখতে বলেছে। আর জ্বালানি তেলের ওপর চাপ কমাতে সপ্তাহে একদিন পেট্রোল পাম্প বন্ধ রাখার পরিকল্পনা করছে।

উৎপাদন ও সঞ্চালনে সার্বিক অবকাঠামোগত সক্ষমতার দিক থেকে বাংলাদেশে চলমান বিদ্যুৎ সংকট নিরসন হতে এ বছর পেরিয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলরা অচিরেই এ সংকটের সমাধান হয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

হে যুবক! কখনো কি সময়ের হিসাব করেছ?

-জাবির হোসেন*

হে যুবক! তুমি কি কখনো করেছ সময়ের হিসাব? যে সময় তুমি অতিবাহিত করেছ সৃষ্টিকর্তার বিধানকে উপেক্ষা করে। একদিন তুমি শিশু ছিলে, তারপর কৈশোর অতিক্রম করে তুমি যৌবনে পদার্পণ করেছ; এরপর তোমাকে বার্ধক্য গ্রাস করবে, অতঃপর তোমাকে এই মায়াভরা পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে। চলে যেতে হবে— না ফেরার দেশে। তোমার মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান, সকল আত্মীয়স্বজন ছেড়ে, যাদের সঙ্গে তুমি এতদিন যাবৎ সময় পার করলে।

কিন্তু তুমি কি কখনো ভেবেছ সেই দিনের প্রতি? যেদিন তোমার দুনিয়াবী জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের হিসাব নেওয়া হবে। তুমি কি ভেবেছ— সেদিন তুমি কী হিসাব দেবে? তোমার যুববয়সের উত্তাল যৌবনে কত রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে সময়কে অতিবাহিত করেছ— তার হিসাব কি রেখেছ?

তুমি কি কখনো ভেবেছ— তোমাকে তোমার প্রতিপালক কেন সৃষ্টি করেছেন? তোমাকে কোন পথে চলতে হবে? — এসব না ভেবে, তুমি খেয়ালখুশীমতো সময় অতিবাহিত করছ। অথচ তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমাকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ ‘মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন; কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/১)*।

হে যুবক! তোমাকেই বলছি। তুমি এখন গান-বাজনা, সিনেমা-নাটক, খেলাধুলা ইত্যাদির প্রতি আসক্ত। তুমি সময় অতিবাহিত করছ— চায়ের দোকানে, পাড়ার মোড়ে আড্ডা মেরে, মোবাইলে অবৈধ প্রেমালাপ ও ভালোবাসার নামে পার্কে বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। কিন্তু তোমাকে তোমার সৃষ্টিকর্তা এজন্য তো সৃষ্টি করেননি। তুমি যে সময় নষ্ট করছ— তার হিসাব আমরা দিতে পারব না। তবে তোমাকে একটি ধারণা দিচ্ছি। তুমি নিজে নিজেই হিসাব কষে দেখো— কত সময় তুমি নষ্ট করেছ বা করছ।

হে যুবক! —জানি তো, তুমি টলিউড, বলিউড, হলিউড, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ভক্ত। এই সমস্ত ইন্ড্রাস্ট্রির সিনেমা দেখে তুমি আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুললেও কিন্তু কোনোদিনের জন্য তোমার অন্তরে পাপবোধ জাগ্রত হয় না। আর জাগ্রত হবেই-বা কীভাবে, তুমি তো সৃষ্টিকর্তার দেখানো পথ থেকে বিমুখ হয়ে আছ।

হে যুবক, তোমাকেই বলছি! —ধরো তুমি প্রায় ১০-১২ বছর বয়স থেকে সিনেমা দেখতে শুরু করেছ এবং প্রতি মাসে গড়ে কমপক্ষে ১০টি করে সিনেমা দেখ। তাহলে এক বছরে সংখ্যাটি ১২০-এ গিয়ে দাঁড়ায়। ধরো, প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই কাজ তোমার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে; তাহলে পরিসংখ্যানটি গিয়ে দাঁড়ায় (২০×১২০)= ২৪০০টি। এটি একটি আনুমানিক পরিসংখ্যান মাত্র। হয়তো তোমার বা অন্যের আরো বেশি হওয়ারই কথা। আল্লাহু আ'লাম।

ধরা যাক, একটি সিনেমার লেন্থ কমপক্ষে আড়াই ঘণ্টা; তাহলে সর্বমোট সময়টি দাঁড়ায়— (২৪০০×২.৫)= ৬০০০ ঘণ্টা। অর্থাৎ কুড়ি বছরে মোট ৬০০০ ঘণ্টা ব্যয় হয়েছে শুধু সিনেমা দেখার পেছনে।

যদি এটাকে দিনে রূপান্তরিত করি, তাহলে (৬০০০÷২৪)= ২৫০ দিন হয়; অর্থাৎ তোমার কুড়ি বছরের টানা ২৫০ দিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে শুধু সিনেমা দেখে পার হয়েছে।

এবার আসা যাক গান প্রসঙ্গে— তুমি সিনেমা দেখার পাশাপাশি গান শোনাতেও অভ্যস্ত। প্রতিদিন কত গান যে শোনো— তার হিসাব রাখনি। হিসাব করার চেষ্টাও করনি। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গান, সিনেমার গান, কত শিল্পির গান যে তুমি শোনো— তার ইয়াত্তা নেই।

সিনেমা দেখার মতো গান শোনাতেও তোমার প্রচুর সময় ব্যয় হয়। প্রতিদিন যে হারে গান শোনার কাজে তুমি সময় অপচয় করো তা হিসাব করা সত্যিই অসম্ভব। তবে আমি একটা আনুমানিক পরিসংখ্যান উল্লেখ করছি— তোমার আত্ম-চিন্তার খোরাক হিসেবে।

ধরো, প্রতিদিন গড়ে তুমি মিনিমাম ১৫টি করে গান শোনো; যার লেন্থ চার মিনিট করে। তাহলে দিনে (১৫×৪)= ৬০ মিনিট অর্থাৎ এক ঘণ্টা ব্যয় হয়। তাহলে এক বছরে ৩৬৫ ঘণ্টা। কুড়ি বছরে সংখ্যাটি হবে (৩৬৫×২০)= ৭৩০০ ঘণ্টা অর্থাৎ প্রায় (৭৩০০÷২৪)= ৩০৪ দিন।

এককথায়, সিনেমা ও গান শোনা মিলিয়ে তোমার কুড়ি বছরে একটানা প্রায় (২৫০+৩০৪)= ৫৫৪ দিন সময় কাটে বা কেটেছে।

হে যুবক! তুমি করেছ কি সময়ের হিসাব! জানি তো— তোমার খেলাধুলাতেও আকর্ষণ আছে। ক্রিকেট ও ফুটবলের পাগল তুমি। টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ পাঁচ দিন বসে বসে এখন আর না দেখলেও— স্কোরের আপডেট খবর ঠিকই রাখ। ওয়ান ডে, টি-টুয়েন্টি, আইপিএল, বিপিএল— কোনোটিও বাদ দাও না। একটি ওয়ানডে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে প্রায় ছয়-সাত ঘণ্টা সময় যায়; টি-টুয়েন্টি ম্যাচে যায় প্রায় তিন ঘণ্টা। একটি ফুটবল খেলা চলে ৯০ মিনিট ধরে। এবার তুমি নিজে নিজে হিসাব কষো তো— আজ পর্যন্ত কত ক্রিকেট আর ফুটবল ম্যাচ দেখেছ।

* এম. এ. (বাংলা), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

হে যুবক! তুমি সকাল-বিকাল চায়ের দোকানে আড্ডা মারো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আড্ডা মারো। এই আড্ডায় কত পলিটিক্যাল ডিবেট আর কত মানুষের গীবত-পরনিন্দা ও পরচর্চা হয়, তা তো তুমি জানোই। তবুও কি তুমি কখনো উপলব্ধি করেছ, যে কত সময় তোমার নষ্ট হলো।

এছাড়াও তোমার আছে মোবাইল গেমসের প্রতি আসক্তি। ফ্রি-ফায়ার, পাবজি— আর কী নামের সব গেম। এতে তুমি কত সময় অতিবাহিত কর— বলো তো।

এখন তুমি ভাবছ, এসব কী বলছে। কী সময় নষ্ট, কী সময় অপচয়। আর কী সব হিসাব-নিকাশ করার কথা আমাকে বলছে। এখন এই যুবক বয়সে একটু মজা-মাস্তি, এন্টারটেইনমেন্ট না করলে আর কবে করব?

হ্যাঁ বন্ধু! তোমার চিন্তার খোরাক জোগানোর জন্যই হিসাবগুলো করতে বললাম। কারণ, যদি তোমার বিশ্বাস হতো, এই দুনিয়ায় তোমার শেষ জীবন। পরকাল বলে কিছু নেই। 'খাও দাও ফুর্তি করো, দুনিয়াটা মস্ত বড়' বা 'জিনে কা হে চার দিন, বাকি হে বেকার দিন' অথবা 'No life, after death', তাহলে এই সময়গুলো ব্যয় করা নিয়ে চিন্তা করার কোনো যুক্তি থাকত না।

কিন্তু তুমি তো মুসলিম। ইসলাম ধর্মের অনুসারী। আর 'ইসলাম' প্রচলিত অর্থে শুধু কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম আল-কুরআনুল কারীমের ভাষায় 'দ্বীন'। যেমন উল্লেখ আছে, ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ 'নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন' *(আলে ইমরান, ৩/১৯)*।

যাঁরা আল্লাহ মনোনীত এই দ্বীনের অনুসারী, তাঁদেরকে বলা হয় মুসলিম। 'মুসলিম' শব্দটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলিম মানে, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাকে মহান আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী।

এখন কোনো ব্যক্তি যদি নিজের ইচ্ছাকে মহান আল্লাহর নিকট সমর্পণ না করে, তাহলে তাঁর সম্মুখে পুরো পৃথিবী উন্মুক্ত। সে যা খুশী খেতে পারবে, সে যা খুশী পরিধান করতে পারবে, সে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলাফেরা করতে পারবে। এককথায়, সে তাঁর মনের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। কেউ তাঁকে বাধা দেবে না, তাঁর পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা থাকবে। তাঁর উপর কোনো সীমাবদ্ধতা থাকবে না। থাকবে না কোনো রেস্ট্রিকশন, থাকবে না কোনো নিষেধাজ্ঞা।

কিন্তু অপরপক্ষে যে মুসলিম হবে, যে নিজের যাবতীয় ইচ্ছাকে মহান আল্লাহর নিকট সমর্পণ করবে, সে নিজ ইচ্ছায় পরিচালিত না হয়ে, পরিচালিত হবে স্রষ্টার ইচ্ছায়। তাঁর উপর রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু সীমারেখা, যার গণ্ডি সে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারবে না।

ইসলাম মানে 'কমপ্লিট কোড অফ লাইফ' অর্থাৎ —পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এখানে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে দিকনির্দেশনা। রয়েছে বাউন্ডারি তথা সীমাবদ্ধতা।

তুমি তো নিজের ইচ্ছাকে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট সমর্পণ করেছ; যিনি এক প্রতাপশালী মর্যাদাবান একক সত্তা। যিনি তোমার-আমার, আমাদের পূর্বপুরুষদের, তথা সমস্ত আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। তুমি তো তাঁর প্রতি বিশ্বাসী। তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। তাঁর এই বিশাল সৃষ্টির সাম্রাজ্যে তুমি এক নগণ্য দাস। তিনি তোমাকে এমনি এমনি পৃথিবীতে পাঠাননি। পাঠিয়েছেন— এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। তুমি যেন সর্বদা তাঁর ইবাদত কর। যেহেতু তুমি সৃষ্টিকর্তার দাস; আর দাসের কর্তব্য হচ্ছে মালিকের কথামতো চলা। মালিকের নিকট একান্ত অনুগত হয়ে থাকা। দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টায় তুমি তাঁর দাস। কোনো মাইক্রো সেকেন্ডের জন্যও তুমি সৃষ্টিকর্তার দাসের বাইরে নও।

এই পৃথিবী হচ্ছে তোমার-আমার জন্য পরীক্ষাগার। আর আমরা হচ্ছি পরীক্ষার্থী। যেমন উল্লেখ আছে পবিত্র কুরআনে, ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য— কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল' *(আল-মুলক, ৬৭/২)*।

দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে এর ফলাফল দেওয়া হবে না। তার জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী পরকাল। সেই পরকালে মহান আল্লাহর আদালতে নিজের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। সেই দিন মাযলূম পাবে ন্যায় বিচার। সেই দিন অত্যাচারী পাবে সাজা। সেই দিন কারো প্রতি কোনো প্রকার যুলম করা হবে না। সেই দিন মানুষের নিজের হাত-পা-চোখ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কী কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব সাক্ষ্য প্রদান করবে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ 'আমি আজ এদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব। এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের' *(ইয়াসীন, ৩৬/৬৫)*।

সেই দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ফয়সালা হবে চূড়ান্ত। অতঃপর সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক (মহান আল্লাহ) মানবজাতির ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করে রায় প্রদান করবেন। এই রায়ে একদল পাবে পুরস্কার তথা জান্নাত, যারা দুনিয়াতে সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত জীবনবিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করেছে। আর অপরদল পাবে শাস্তি তথা জাহান্নাম, যারা সৃষ্টিকর্তার বিধানকে হেয় তুচ্ছ করত অহংকার বসে অমান্য করেছে।

মুসলিমরা তো সেই দিনের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাসী। তাই দুনিয়াবি জীবনে মহান আল্লাহর ভৃত্য বা চাকর হওয়া সত্ত্বেও নিজ দায়িত্বে ফাঁকি মেরে সিনেমা, গান-বাজনা ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে সময় অপচয় করার স্পর্ধা দেখিয়ে যে অপরাধ করেছ, তা থেকে রক্ষা পাবে তো?

প্রিয় নবীজি ﷺ-এর একটি হাদীছ শোনো— ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আদম সন্তানকে স্ব স্ব স্থান থেকে এক কদমও নড়তে দেওয়া হবে না। যথা: (১) সে তার জীবনকাল কীভাবে অতিবাহিত করেছে? (২) যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে? (৩) ধনসম্পদ কীভাবে উপার্জন করেছে? (৪) কোন পথে তা ব্যয় করেছে? (৫) সে দ্বীনের কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করেছে কী না?'[১]

হাদীছের মর্মানুযায়ী আমরা অপরাধী। আমরা অপরাধী সময়ের অপচয়ের জন্য। আমরা অপরাধী অর্থের অপব্যবহারের জন্য। আমরা অপরাধী জ্ঞান অনুপাতে আমল না করার জন্য। কত সময় ও অর্থ অপচয় করেছি গান ও সিনেমার কাজে! উপেক্ষা করেছি প্রতিপালকের বাণী! কী হিসাব দেব— সেই দিন মহান প্রতিপালকের দরবারে?

আশা ও ভয়মিশ্রিত অন্তরে আমাদের জীবনবিধান 'পবিত্র কুরআন' পড়া উচিত। তাহলে জানতে পারব— আমাদের রব অত্যন্ত দয়ালু ও অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ। তিনি নিজেই বলেছেন, ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ 'বলুন, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৩)*।

তবে, তিনি শর্ত প্রদান করেছেন পরের আয়াতে, ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾ 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, তৎপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৪)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জন্য শেষ নবী হিসাবে মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্বাচন করেছেন। তাকে রোল মডেল হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন। যেমন উল্লেখ আছে, ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাঁদের জন্য রাসূলুল্লাহ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আল-আহযাব, ৩৩/২১)*।

১. তিরমিযী, হা/২৪১৬, হাসান; সিলসিলা ছহীহা, হা/৯৪৬।

হে যুবক! তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি, তুমি সত্যের পথে এসো। তওবা করো। রঙিন পর্দার নায়ক-নায়িকাদের পরিত্যাগ করে, আমাদের সকলের রোল মডেল যাকে আল্লাহ নির্বাচন করেছেন, তাঁর আদর্শ গ্রহণ করো। দুনিয়ার কোনো সেলিব্রেটি ক্বিয়ামতের মাঠে তোমার-আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। শুধু এগিয়ে আসবেন শেষ নবী তথা মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি আমাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে শাফা'আত প্রার্থনা করবেন। তাই তোমার-আমার সকলের রোল মডেল হোক— 'রাসূলুল্লাহ ﷺ'। দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের তুলনায় প্রাধান্য পাক আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন।

তাহলে আশা করা যায় ক্ষমা পাব। কারণ, মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে, ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 'আপনি বলে দিন, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আলে ইমরান, ৩/৩১)*।

ছোটবেলায় তুমি নিশ্চয় কবিতার এই লাইনগুলো পড়েছিলে,

'সময় চলিয়া যায়
নদীর স্রোতের ন্যায়
যে জন না বুঝে, তারে ধিক্ শত ধিক।
বলিছে সোনার ঘড়ি, 'টিক্ টিক্ টিক্'।[২]

সময় চলে যাবে। দুনিয়া থেকে তুমিও একদিন হারিয়ে যাবে। যদি তুমি ইহজীবনে সময়কে ভালো কাজে না লাগাও, তবে পারলৌকিক জীবনে কস্মিনকালেও সফল হতে পারবে না। আর যদি পরকালে ব্যর্থ হও, তবে তোমার উচ্চ ডিগ্রি, তোমার চাকরি, তোমার স্ট্যাটাস— 'ষোল আনাই মিছে'। এই সত্য উপলব্ধি করতে যদি তুমি ব্যর্থ হও, তবে— 'ধিক তোমায় শত ধিক'।

পরিশেষে তোমার কাছে অনুরোধ, তুমি সময়কে মূল্যায়ন করো। কুরআন ও হাদীছের আলোকে যৌবন বয়সে ইবাদতে অভ্যস্ত হও। যদি তুমি তোমার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে পার করতে পার, তবে তোমার জন্য সুসংবাদ রয়েছে। কাল ক্বিয়ামতের মাঠে মহান আল্লাহ তোমাকে আরশের নিচে ছায়া প্রদান করবেন; যেদিন অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। শুধু সাত শ্রেণির মানুষ সেই বিশেষ ছায়া লাভ করবে; তার মধ্যে এক শ্রেণি হলো, 'সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে'।[৩]

আশা করি তুমি পারবে।

২. কবিতা : 'কাকাতুয়া' —যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬০।

আল-কুরআনে মৌমাছি ও মাকড়সা

-আব্দুর রাযযাক বিন মাসির*

১. মৌমাছি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ - ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

'তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে অহী করেছেন যে, তুমি গৃহ নির্মাণ করো পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার করো, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ করো। ওর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগমুক্তি; অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে' *(আন-নাহল, ১৬/৬৮-৬৯)*।

উক্ত আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি মৌমাছির অন্তরে অহী করেছেন। এখন আমাদের জানা দরকার যে, অহী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অহী অর্থ ইলহাম। যেমন ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ-এর মতে অহী নাযিলের সাতটি পদ্ধতির অন্যতম হলো ইলহাম। (ইলহাম অর্থ— জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি কারো হৃদয়ে কোনো কিছু সম্পর্কে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা) ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের অহী করে থাকেন, যা নবুঅতের অংশ নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা মৌমাছির অন্তরে অহী তথা অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেন। মৌমাছি ডানার সাহায্যে তার গৃহ নির্মাণ করে। এই ছোট্ট পতঙ্গটির মৌচাক (বাসা) বানানোর যে কৌশল, তা দেখে আশ্চর্য না হয়ে কেউ পারে না। তার বাসা কতই না সুন্দর! কতই না চমৎকার কারুকার্য খচিত শিল্পকর্ম! এরপর বলা হলো যে, (প্রত্যেক প্রকার ফল হতে আহার করো)। আয়াতে ثُمَّ ব্যবহার করা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় এটা প্রমাণিত সত্য যে, কোনো ফুলে যদি মৌমাছি, পিঁপড়া, পাখি বা প্রজাপতি না বসে, তাহলে সেই ফুল বড় হয় না। আর সেই ফুল হতে ফল হয় না। কারণ ফুল বড় হতে ও ফল হতে গেলে ফুলের পরাগায়নের দরকার। যেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মৌমাছির মাধ্যমে হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাতাস বা মধু আহরণকারী পোকা-মাকড় ও পাখি ইত্যাদির মাধ্যমেও হয়ে থাকে।

এখানে আরেকটা কথা বলা প্রয়োজন যে, মৌমাছি মধু সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ায়। যখন কোনো মৌমাছি মধুর সন্ধান পায়, তখন সে নাচের মাধ্যমে অন্যান্য মৌমাছিকে মধু সংগ্রহের স্থান সম্পর্কে অবহিত করে। তখন সকল মৌমাছি সেখানে গিয়ে মধু সংগ্রহ করে। মধু সংগ্রহের পর তারা মৌচাকে ফিরে যায়। মৌচাকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে পথ চিনতে তাদের মোটেও ভুল হয় না। মৌচাকে গিয়ে তারা ডিম, বাচ্চা ও মধুর নিকট অবস্থান গ্রহণ করে। আর মৌমাছি তাদের পিছনে অংশ দিয়ে ডিম দেয়।

তারপর বলা হয়েছে যে, (তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ করো) তাফসীর ইবনু কাছীরে উল্লেখ আছে, ক্বাতাদা রহিমাহুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনে আসলাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, এর অর্থ অত্যন্ত বাধ্য ও অনুগত হয়ে'।[১] তারপর বলা হয়েছে, (তাদের [মৌমাছির] উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগমুক্তির ব্যবস্থা)। এই আয়াতে شِفَاءٌ শব্দটিকে অনির্দিষ্ট (نكرة) ব্যবহার করে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে যে কোনো ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা আছে। এভাবেই পবিত্র কুরআনে রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির নানা উপায় সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা হয়েছে।

* নবম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

১. তাবারী, ১৭/২৪৯।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا فَقَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ.

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোনো এক ছাহাবী এসে তার ভাইয়ের পেটের সমস্যার কথা বললেন। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মধু পান করাতে বললেন। (দ্বিতীয় দিনও) এসে আবার ছাহাবী বললেন, অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। এইভাবে (ঐ ছাহাবী তিন দিন আসলেন আর) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই উত্তর দিলেন। অতপর ঐ ছাহাবী চতুর্থ দিন আসলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও তাকে মধু পান করার পরামর্শ দিলেন। তখন তিনি (ছাহাবী) বললেন, অসুখের কোনো পার্থক্য হয়নি (পেটের সমস্যা পূর্বের মতো বলবৎ আছে)। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে।[২] এখানে উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হচ্ছে ওষুধের কোনো দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেজাজের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। অপর এক হাদীছে আছে, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিনটি জিনিসে শিফা বা রোগমুক্তি রয়েছে। শিঙ্গা লাগনো, মধু পান করা ও লোহা দ্বারা দাগ দিয়ে নেওয়া। কিন্তু আমার উম্মতকে আমি দাগ দিতে নিষেধ করেছি'।[৩]

তারপর বলা হয়েছে, (অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে) তাফসীর ইবনু কাছীরে উল্লেখিত হয়েছে, হে মানবমণ্ডলী! মৌমাছির মতো অতি দুর্বল ও শক্তিহীন প্রাণীর মধু সংগ্রহ করা, মোম তৈরি করা, স্বাধীনভাবে বিচরণ করা, বাসস্থান চিনতে ভুল না করা ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণার জন্য তোমাদের খোরাক রয়েছে। যারা আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্ব নিয়ে ভাবে, তাদের জন্য এগুলোতে বড় নিদর্শন রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলার সীমাহীন প্রজ্ঞা, অসীম জ্ঞান এবং পরম দয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

২. মাকড়সা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

'যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত ঐ মাকড়সার মতো, যে ঘর বানায়। আর সকল ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সবচেয়ে দুর্বল ঘর, যদি তারা জানত' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪১)*।

ড. মরিস বুকাইলি তার 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' বইয়ে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, উক্ত আয়াতে মাকড়সার ঘরের অস্থায়ী অবস্থা বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। মাকড়সার ঘরের মতো হালকা অস্থায়ী জিনিস আর কোনো কিছু হতে পারে না। উক্ত আয়াতে আরও বলা হয়েছে, তাদের অবস্থা মাকড়সার ঘরের মতোই ভঙ্গুর ও পতনশীল, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাফসীর ইবনু কাছীরে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক গ্রহণ করে, এদের দৃষ্টান্ত তাদের মতো, যারা মাকড়সার জালের নিচে আশ্রয় পাওয়ার প্রত্যাশা করে।

গ্রন্থি থেকে নির্গত এক প্রকার লালার সাহায্যে মাকড়সা ঘর বানায়। জালিকা দিয়ে তৈরি তাদের এই ঘর অনেক পাতলা ও হালকা, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। জালিকা দিয়ে এ জাতীয় গৃহ নির্মাণ করা কোনো মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। মাকড়সার তৈরি এই ঘরের কারুকার্য বা শৈল্পিক নকশা দেখে কোনো জ্ঞানীই হতবাক না হয়ে পারে না।

উল্লেখ্য, মাকড়সার স্নায়ুবিক কোষের অবস্থানগত বৈচিত্র্যের কারণেই জ্যামিতিকভাবে নিখুঁত অমন অসাধারণ বুননকার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়ে থাকে।

আল্লাহ আমাদের উপলব্ধি করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

২. ফাতহুল বারী, ১০/১৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২২১৭।
৩. ফাতহুল বারী, ১০/১৪৩।

আতরওয়ালা বন্ধু

*-মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান**

আতরওয়ালা বন্ধু! কী অবাক হচ্ছেন, তাই না? অনেকে হয়তো ভাবছেন আতরওয়ালাকে আবার কীভাবে বন্ধু বানায়? আমি যখন আমার এলাকার ছোট ভাই অথবা বন্ধুবান্ধব ও বড় ভাইদেরকে বলি যে, 'ভাই জীবনে বন্ধু বানাতে হলে আতরওয়ালা বন্ধু বানাবেন। তখন তারা কিছুক্ষণ চিন্তায় পড়ে যায়। তারা আমাকে বলে, 'ভাই, আতরওয়ালাকে আমি আবার কীভাবে বন্ধু বানাবো? সে তো সবসময় আতর নিয়েই ব্যস্ত থাকে'। যাহোক, সুধী পাঠক! চিন্তার কোনো কারণ নেই। আজকে এই বিষয়টা নিয়েই কিছু লেখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের জীবনে কম-বেশি সবারই বন্ধুবান্ধব আছে। বন্ধু নেই এমন মানুষ নেই বললেই চলে। স্বয়ং আমাদের রাসূল ﷺ-এরও বন্ধু ছিল। ছাহাবী শব্দের অর্থই হচ্ছে— সঙ্গী অথবা সাথী। তাই তো আল্লাহ তাদের উপর খুশি হয়ে বলেন, ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে' *(আল-মুজাদালা, ৫৮/২২)*।

আমাদেরও কম-বেশি বন্ধু আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের যারা বন্ধু আছে তারা কেমন বন্ধু? আর আমাদের বন্ধু সম্পর্কে ইসলাম কী বলে? সেটা কি আমাদের জানা আছে?

তাহলে চলুন, আতরওয়ালা বন্ধু সম্পর্কে হাদীছে কী এসেছে দেখে নিই— আবূ মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর উদাহরণ আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরীদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে'।[১]

আমি যখন মানুষকে এই হাদীছটি বলি, তখন তারা অনেকেই বলে, 'ভাই আতরওয়ালা তো আতর বিক্রি করে তার সাথে আমরা বন্ধুত্ব করব কীভাব?' আসলে ব্যাপারটা এরকম না। এখানে আতরওয়ালা বন্ধু সম্পর্কে তাদেরকে বলা হয়েছে, যারা ঈমানদার, তাক্বওয়াবান, পরহেযগার, দ্বীনদার, মুত্তাক্বী, সত্যবাদী, যার আখলাক খুবই সুন্দর, যাকে দেখলে আখেরাতের কথা স্মরণ হয়।

আপনি যখন এ সকল মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করবেন, দেখবেন অটোমেটিক আপনার মাঝে আতরের সুঘ্রাণ ছড়াবে। কেননা আমরা হাদীছটিতে দেখতে পাচ্ছি, যখন আপনি কোনো আতরের দোকানে আতর কিনতে যাবেন, তখন হয় আপনি আতর কিনবেন, না হয় আতরের সুঘ্রাণ আপনার মাঝে থাকবে। আর আপনি আপনার বাসায় যাওয়ার পরও সেই আতরের সুঘ্রাণ টের পাবেন।

কেননা আপনি যখন একজন দ্বীনদার বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব করবেন, তখন তার ভালো গুণগুলো আপনার মাঝে প্রবেশ করতে থাকবে। আর এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে— আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং তোমাদের সকলেরই খেয়াল রাখা উচিত, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে'।[২]

এছাড়াও একজন দ্বীনদার বন্ধু আপনাকে প্রতিনিয়ত উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকবে। আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। আপনার বিপদেআপদে নানাভাবে আপনাকে সাহায্য করবে। আপনাকে সৎ পথে চলতে সহযোগিতা করবে। আল্লাহর আনুগত্যে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করবে; পাপ কাজে বাধা দান করবে। আপনাকে কখনোই সে ক্ষতির মুখে পড়তে দিবে না। আর এটাই হলো আতরওয়ালা বন্ধু। আর একটু উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হবে ইনশাআল্লাহ।

---

* শিক্ষার্থী, সরকারি মোল্লারটেক উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণখান, ঢাকা।

১. ছহীহ বুখারী, হা/২১০১।

২. তিরমিযী, হা/২৩৭৮, হাদীছ হাসান।

ধরুন, আপনি একজন দ্বীনদার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করলেন, হঠাৎ একদিন দেখলেন সে সমাজে গরীব-মিসকীনদের জন্য কাজ করছে অথবা দেখলেন সমাজে নানা বিষয়ে সে মানুষকে সহযোগিতা করছে এবং পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথারীতি মসজিদে আদায় করছে। এছাড়াও সমাজের খারাপ বখাটে ছেলেদের থেকে সবসময় দূরে থাকে, ঠিক তখন দেখবেন আপনার বাসার মানুষজন আপনাকে বলবে, 'কীরে ওই ছেলেটা তোর বন্ধু না?' 'সে তো খুব ভালো ছেলে', 'ওর সাথেই সবসময় মিশবি'। সুতরাং দেখলেন তো কীভাবে আপনার বাসায়ও আতরের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে গেল? আর একেই বলে আতরওয়ালা বন্ধু।

এছাড়াও আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো!' *(আত-তওবা, ৯/১১৯)*।

আচ্ছা অনেক তো আতরওয়ালা বন্ধু নিয়ে বললাম, এবার না হয় একটু হাপরওয়ালা বন্ধু নিয়ে বলি? কেননা হাদীছে আতরওয়ালা বন্ধুর সাথে সাথে হাপরওয়ালা বন্ধুর কথাও বলা হয়েছে এবং তার থেকে দূরে থাকারও নির্দেষ দিয়েছেন। যেমনটি হাদীছে এসেছে— 'কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে'।

এখানে কর্মকারের হাপর দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে তা হলো, যার ভিতর আল্লাহ তাআলার প্রতি তাক্বওয়া নেই। দুনিয়াতে যারা খারাপ, অসৎ, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে না, বরং আরও বিভিন্ন খারাপ কাজে লিপ্ত; সে প্রতিনিয়ত গুনাহ করে যাচ্ছে। সমাজের মানুষ তাকে খারাপ অথবা বখাটে জানে। ঠিক এরকমটাই হচ্ছে হাপরওয়ালা বন্ধু, যার সাথে চলাফেরা করলে হয় আপনার ঘর অথবা আপনার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় আপনি তার দুর্গন্ধ পাবেন। একটি উদাহরণ দেই তাহলে কিছুটা ক্লিয়ার হবেন ইনশাআল্লাহ। ধরুন, আপনি এমন একজনের সাথে বন্ধুত্ব করলেন, যে ঠিক হাদীছের হাপরওয়ালা বন্ধুর মতো, যে হয়তো ধূমপান করে কিংবা নেশা করে। সমাজের মানুষ তাকে বখাটে হিসাবে জানে। যার ভিতরে নেই আল্লাহ তাআলার প্রতি তাক্বওয়া; নেই তার ভিতর ছালাত, ছিয়াম, পরহেযগারিতা। এছাড়াও রয়েছে আরও নানাবিধ সমস্যা।

তো একদিন তার সাথে বাইরে বের হলেন, দেখলেন সে একটি সিগারেট কিনে সেটা ধরাচ্ছে আর নানাবিধ নেশা করছে। কিন্তু আপনি তার সাথে নেশা করলেন না অথবা ধূমপানও করলেন না। যখন আপনি বাসায় যাবেন, ঠিক আপনার বাসার মানুষজন আপনাকে সন্দেহ করবে আর বলবে, 'কীরে তুই কি ধূমপান করে এসেছিস?' কেননা তারা আপনার শার্ট অথবা জামাকাপড় থেকে ধূমপানের দুর্গন্ধ পাবে। এছাড়াও সেই বন্ধু সমাজে খারাপ কাজ করলে তখন কিন্তু আপনার বাসাতেও তার প্রভাব পড়বে। মানুষ আপনার পিতা-মাতাকে দেখলে বলবে, 'আপনার ছেলেটা না ওই খারাপ বখাটে ছেলের সাথে চলে'। আর এভাবেই তার সেই খারাপ দোষগুলো আপনার ভিতরে প্রবেশ করতে থাকবে। আর এজন্যই হাদীছে তার থেকে দূরে থাকার কথা এসেছে।

এছাড়াও মানুষ কিয়ামতের দিন বলবেন, ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ 'হায়, আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৮)*।

সুতারং সুধী পাঠক! বন্ধু নির্বাচন করার সময় সতর্ক থাকুন। আপনার উপর নির্ভর করে আপনি কার সাথে বন্ধুত্ব করবেন। যদি আতরওয়ালার সাথে বন্ধুত্ব করেন, তাহলে সে আপনার দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে। আর যদি হাপরওয়ালার সাথে বন্ধুত্ব করেন, তাহলে সে আপনার দুনিয়াতে ও আখেরাতে শুধু ক্ষতিই করে যাবে। তাই ভেবেচিন্তে বন্ধু নির্বাচন করুন। আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

বাঁচো এবং বাঁচাও

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক মাহমূদ
শিক্ষক (অব.), মনিপুর স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

সূরা তাহরীমের ৬নং আয়াতে আল্লাহ মুমিনদেরকে বলেন,
জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করো,
নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজন।
জাহান্নামের যোগ্য ব্যক্তি, আত্মরক্ষা করতে পারবে না,
কঠোরপ্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে,
রেহাই পেতে পারবে না।
উমার ফারূক জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
আমরা গোনাহ থেকে বাঁচব তাঁর বিধান মানব,
তাওফীক্ব দিলে আল্লাহ।
জাহান্নামের অগ্নি থেকে, পরিবার-পরিজন কীভাবে বাঁচাব?
আল্লাহর আদেশ-নিষেধ তাদেরকে করো,
সেটাই হবে বাঁচানো।
স্ত্রী-সন্তানসন্ততিকে ফরয কর্মসমূহ শিক্ষা দিতে ফক্বীহগণ বলেন,
হালাল-হারামও শিক্ষা দেবে, তাতে স্বীয় কর্তব্য হবে পালন।
আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন, এক হাদীছে আছে,
যে বলে, হে আমার স্ত্রী-সন্তানগণ!
তোমাদের জান্নাত তোমাদের কাছে।
ক্বিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি, সর্বাধিক আযাবে থাকবে,
যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে, মূর্খ ও উদাসীন হবে।
ভবে সন্তানসন্ততি সুখী হোক, শুধু এ চিন্তা করা ঠিক নয়,
তার চেয়েও বড় চিন্তা, যাতে তারা জাহান্নামের ইন্ধন না হয়।
রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল,
প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে,
শাসক পরিবারের কর্তা স্ত্রীও খাদেম,
এরা জাবাবদিহির অন্তর্ভুক্ত রবে।

হাসি

-মো. জোবাইদুল ইসলাম
আলিম ২য় বর্ষ, সুফিয়া নুরিয়া ফাজিল মাদরাসা,
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

হাসি হলো তিন প্রকারের
এক, সাধারণ হাসি
দাঁত দেখা যায়, একটু আওয়াজ
মুখটা হয় না বাসি।
দ্বিতীয় প্রকার মুচকি হাসি
রাসূলেরই কর্ম
মুচকি হাসি হেসে সবে
কামিয়ে নাও পুন্য।
তৃতীয় প্রকার অট্টহাসি
হয় যে বেশি শব্দ
দাঁত দেখা যায়, ভাঁজ কপালে
হবে তুমি জব্দ।
জ্ঞানী লোকে মুচকি হাসে
ফোটে হাসির রেখা
আজ থেকে তাই শুরু করো
মুচকি হাসি শেখা।

শিক্ষাগুরু

-মিজানুর রহমান
মাওনা বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর।

শিক্ষাগুরু মহান মানুষ
মহান তাঁদের মন,
শিক্ষা দিয়ে দেশজাতিকে
করে আলিঙ্গন।
মূর্খতাকে দূর করিয়ে
দেয় ছড়িয়ে নূর,
শিক্ষাগুরুর পরশ পেয়ে
যায় কেটে যায় ঘোর।

তোমাতেই সব

-মাযহারুল ইসলাম আবির
নবম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

অসহনীয় লাগে সবকিছু, থাকি যবে পাপের অতলে,
চোখের জলে কপোল ভিজে, স্বস্তি পাই তব মুনাজাতে।
নৈরাশ্যের অগাধ সমুদ্রে ভাসি আমি, পাই না খুঁজে তট,
আশ্বাস পাই প্রভু, সরিলে তোমায় এ চিত্তপট।
মানবিক ব্যথা, প্রীতিশূন্যতায় ভরা জীবন-ফোয়ারা,
এ হৃদে বহে সদা তোমার ভালোবাসার স্রোতধারা।
মন খারাপের দিনে পাশে থাকে না কোনো জন,
নীরবে-নিভৃতে, গাঢ় নিশুতিতে করি তোমায় স্মরণ।
এফোঁড়-ওফোঁড় হয় এ হৃদয় দেদার কষ্টের ঝড়ে,
হৃদের বেদন কমাতে তাই ছুটি তোমার রহম পানে।
তিমিরময় নিবিড় নিশায়, হয়ে যাই উদ্ভ্রান্ত,
আলোর পথ পাই না খুঁজে যদি না দেখাও পথ-প্রান্ত।
হাজারো সমস্যার ফাঁদে রাখি আমি পা,
উদ্ধারক হয় সদা তোমারি ক্ষমতা।
ভুলের গর্তে পড়ি আমি, কাঁদি আফসোস-পরিতাপে,
তখনই দেখা মিলে তোমার, ক্ষমার ঝুলি হাতে।
আছে যত মোর পাপ, ক্ষমা করো প্রভু।
আর যেন পাপাত্মা নাহি হই কভু।
তুমিতো আল্লাহ মহান, তুমিতো সব...
তুমি মোদের প্রভু-মালিক, অদ্বিতীয় রব।

বাংলাদেশ সংবাদ

দেশের জনসংখ্যা এখন ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার

বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখন ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৮ কোটি ১৭ লাখ ১২ হাজার ৮২৪, নারীর সংখ্যা ৮ কোটি ৩৩ লাখ ৪৭ হাজার ২০৬। পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। গত এক দশকে দেশে জনসংখ্যা বেড়েছে দুই কোটি ১১ লাখ ১৪ হাজার ৯১৯ জন। সারা দেশে গত ১৫ জুন একযোগে শুরু হয় জনশুমারি ও গৃহগণনা কার্যক্রম। গত ২১ জুন জনশুমারি শেষ হওয়ার কথা থাকলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলায় বন্যা শুরু হওয়ায় এসব জেলায় শুমারি কার্যক্রম ২৮ জুন পর্যন্ত চলে। ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যায় দেখা গেছে, মুসলিম ৯১ শতাংশ। সনাতন ধর্মাবলম্বী ৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ। ২০১১ সালের জনশুমারিতে হিন্দু ছিল ৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল শূন্য দশমিক ৬১ শতাংশ। আগের শুমারিতে ছিল শূন্য দশমিক ৬২ শতাংশ। প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, জনসংখ্যার বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ২২। ২০১১ সালের জনশুমারিতে গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১ দশমিক ৩৭। জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১১৯ জন। ২০১১ সালের শেষ জনশুমারিতে যা ছিল ৯৭৬ জন। স্বাক্ষরতার হার বেড়ে হয়েছে ৭৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ। আগের শুমারিতে ছিল ৫১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। পাঁচ বছরের ঊর্ধ্বে মুঠোফোন ব্যবহারকারী এখন ৫৫ দশমিক ৮৯ শতাংশ। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩০ দশমিক ৬৮ শতাংশ। দেশে এখন মোট খানার সংখ্যা ৪ কোটি ১০ লাখ। আগের শুমারিতে ছিল ৩ কোটি ২১ লাখ। মানে খানার সংখ্যা বাড়ছে। খানার আকার এখন চার সদস্যের। আগে যা ছিল ৪ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০০১ সালে দেশে জনসংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৪৩ লাখ। ১৯৯১ সালে ছিল ১০ কোটি ৬৩ লাখ। ১৯৮১ সালে ছিল ৮ কোটি ৭১ লাখ এবং ১৯৭৪ সালের প্রথম শুমারিতে দেশে জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ১৪ লাখ।

বাংলাদেশে মাথাপিছু খাদ্য অপচয় বছরে ৬৫ কেজি

সারা দুনিয়াতে প্রতি বছর যত খাবার উৎপাদন হয় তার একটি বড় অংশ মাঠ থেকে আর খাবার টেবিল পর্যন্ত পৌঁছায় না। সেটি অপচয় হয়ে যায়। আর খাদ্য অপচয়ের ক্ষেত্রে উন্নত, উন্নয়নশীল আর অনুন্নত কেউই বাদ যায় না। বাংলাদেশে প্রতি বছর যত খাবার উৎপাদন হয়, তারও একটি বড় অংশ ভাগাড়ে যায়, মানে নষ্ট হয়। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা ইউনেপ ২০২১ সালে ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স (Food Waste Index-2021) নামে রিপোর্ট প্রকাশ করে যাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বছরে এক কোটি ৬ লাখ টন খাদ্য অপচয় হয়। মাথাপিছু খাদ্য অপচয়ের হারও বাংলাদেশে অনেক বেশি। ইউনেপের ওই ইনডেক্স অনুযায়ী একজন বাংলাদেশি বছরে ৬৫ কেজি খাদ্য উপাদান কিংবা তৈরি খাদ্য নষ্ট করেন। ইউনেপ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি খাবার অপচয় হয় চীনে। সেখানে বছরে খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ৯ কোটি ১৬ লাখ টন। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের পর তৃতীয় সর্বোচ্চ খাদ্য অপচয় হয় বাংলাদেশে। ২০২১ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বাংলাদেশে একটি গবেষণা চালায় যাতে বলা হয়, বাংলাদেশে উচ্চ আয়ের পরিবারে বেশি খাদ্য অপচয় হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ আয়ের পরিবারে এক মাসে মাথাপিছু ২৬ কেজি খাদ্য অপচয় হয়। তুলনায় মধ্য এবং নিম্ন আয়ের পরিবারে অপচয় কম হয়। এফএও'র গবেষণায় দেখা গেছে, শস্যদানা মানে চাল, গম ও ডাল এসব উৎপাদন থেকে মানুষের প্লেট পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই প্রায় ১৮ শতাংশ অপচয় হয়। ফল আর সবজির ক্ষেত্রে অপচয় হয় ১৭ থেকে ৩২ শতাংশ পর্যন্ত। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, ২০৭৫ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৯৫০ কোটিতে। এই বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য ভবিষ্যতে আরো খাদ্যের দরকার হবে। শুধু অপচয় বন্ধ করেই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে মনে করেন গবেষকরা।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

এক-তৃতীয়াংশ বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ফেসবুক

ফেসবুকের কারণেই সম্প্রতি বেড়েছে বিবাহ বিচ্ছেদের হার। বিচ্ছেদ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা বলছেন, ইদানিং ফেসবুকের কারণেই বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলছে। ২০১৮ সালে যুক্তরাজ্যের একটি বিবাহবিচ্ছেদ ওয়েবসাইট বলেছিল যে, দেশটির 'বিহেভিয়ার পিটিশন' (Behaviour Petition)-এর ২০ শতাংশে 'ফেসবুক' শব্দটি রয়েছে, যার অর্থ সাইটটি কোনো না কোনোভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দায়ী ছিল। সম্প্রতি সেই হার ৩৩ শতাংশে পৌঁছেছে। বিবাহিতরা অনলাইনে নতুন কারো সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ছেন বা প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। এছাড়াও সন্দেহপ্রবণ দম্পতিরা তাঁদের সঙ্গীকে পরীক্ষা করার জন্যও ফেসবুক ব্যবহার করছেন। এক সময়ের সুখী দম্পতি, যারা আলাদা হয়ে রয়েছেন, কিন্তু এখনও বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি, তাদের অনেকে পরস্পরের বিরুদ্ধে বাজে মন্তব্য পোস্ট করার জন্য ফেসবুকে ব্যবহার করেন। এতে একে অপরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ বাড়ছে এবং সমঝোতার সুযোগ কমে যাচ্ছে। এছাড়াও, ফেসবুক বন্ধুরাও

বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হয়ে উঠছে। তারা অনেকেই বন্ধু দম্পতিদের ব্যক্তিগত বিবাদে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলছেন। কেউ হয়তো ফেসবুক ব্যবহার করে প্রকাশ্যে প্রতারণা করছেন বা প্রকাশ্যে অন্যকে অপমান করছেন। বহু ব্যবহারকারীর কাছে ফেসবুক হয়ে উঠেছে প্রতিশোধের অস্ত্র বা ভঙ্গুর সম্পর্কের বাজার এবং এভাবেই বাড়ছে বিচ্ছেদ।

মুসলিম বিশ্ব

৫০ বছরের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম হবে ইসলাম

আগামী ২০৭০ সালে অনুসারীর সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের অন্য সব ধর্মকে ছাড়িয়ে যাবে ইসলাম ধর্ম। অর্থাৎ এখন থেকে ৫৩ বছর পর বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে মুসলিম উম্মাহ। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পিউ রিসার্চ সেন্টার (Pew Research Center) তাদের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছে, ২০১০ সালের হিসাব অনুসারে গোটা বিশ্বে খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিল মোট ২১৭ কোটি। অনুসারীর সংখ্যার দিক থেকে এর পরই ছিল ইসলাম ধর্ম। ওই সময় বিশ্বে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিল মোট ১৬০ কোটি। তবে আগামী ৫ দশক পর খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের পেছনে ফেলে সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি হবে মুসলিমরা। এর প্রধান কারণ হলো সারা বিশ্বে মুসলিমদের জন্মহার বেশি। বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে জন্মহার ৩ দশমিক ১ শতাংশ। অপরদিকে, খ্রিষ্টানদের জন্মহার ২ দশমিক ৭ শতাংশ। বর্তমানে তরুণ অনুসারীর দিক থেকে অন্য সব ধর্মের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে ইসলাম ধর্ম। বর্তমান বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের নিচে। আবার ইসলাম ধর্মের ৩৪ শতাংশ অনুসারীর বয়স ১৫ বছরের কম। অর্থাৎ আগামী দিনগুলোতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের সন্তান জন্ম দেওয়ার সুযোগ বেশি থাকবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী নাস্তিকের সংখ্যাও অনেক কমে যাবে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ নাস্তিক রয়েছে। আগামী ২০৫০ সালে তা কমে দাঁড়াবে ১৩ দশমিক ২ শতাংশ। ২০১০ সাল থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত সময়ে গোটা বিশ্বে ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারী। তবে একই সময়ে ইসলাম ধর্মের অনুসারী বাড়বে ৭৩ শতাংশ। সেই পরিসংখ্যানেই আগামী ২০৭০ নাগাদ বিশ্বে সবচেয়ে বড় ধর্ম হয়ে দাঁড়াবে ইসলাম।

ইসলাম গ্রহণ করলেন মালাউয়ির ২০০ মানুষ

ব্রিটিশ নওমুসলিম আব্দুর রহীম গ্রিনের দাওয়াতে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার দেশ মালাউয়ির অন্তত ২০০ অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে (আল-হামদুলিল্লাহ!)। ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁর নাম ছিল অ্যান্থনি ফ্যাটসাউফ গালভিন গ্রিন। ১৯৮৮ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলিম হওয়ার পর তিনি সরাসরি মানুষের কল্যাণমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েন। ইসলামের মৌলিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি পবিত্র কুরআন হিফয করেন। আব্দুর রহীম গ্রিন তাঁর বাকি জীবনটাও ইসলাম প্রচার করে এবং গরীব-ইয়াতীমদের সাহায্য করে কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে এক দেশ থেকে আরেক দেশের ধর্মীয় সভা-সেমিনারে অবিরত ছুটে চলেছেন তিনি। উল্লেখ্য, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার দেশ মালাউয়ির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ খ্রিষ্টান। সাম্প্রতিক সময়ে দেশটিতে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে ইসলাম। দেশটির ইসলামী সেবা সংস্থা ও সংগঠনের তথ্য মতে, স্থানীয় মুসলিমদের সংখ্যা অতি অল্প সময়ে শতকরা ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশ হয়েছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

এবার বন্যার সময় পানিতে ভেসে থাকবে বাড়ি

প্রযুক্তিবিদ, বৈজ্ঞানিক ও গবেষকদের অভিনব পরিকল্পনা বিশ্ববাসীকে নানা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রযুক্তি এখন এতটাই এগিয়েছে যে, ভূমিকম্প, বন্যা বা অন্য কোনো বিপর্যয়ের সময় ড্রোন ও রোবটের মাধ্যমে বিপর্যস্তদের উদ্ধার করা হয়। এমনকি ভূমিকম্পের সময় বহুতল বাড়িকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে অনেক যন্ত্রও আবিষ্কার করা হয়েছে, যেগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে কম্পনের তীব্রতা এতটাই কম অনুভূত হবে যে, বহুতলগুলো ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকবে না। সম্প্রতি বন্যার হাত থেকে বাঁচার জন্যও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে জাপানের একটি সংস্থা। 'ইচিজো কোমুতেন' (Ichijo Komuten) নামে আবাসন নির্মাণকারী সংস্থা প্রধানত বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য এক বিশেষ ধরনের বাড়ি তৈরি করছে। বন্যার সময় পানি প্রবাহ শুরু হলে এই বাড়ির ভেতরে পানি ঢুকতে পারবে না। বরং পানির ওপরেই ভেসে থাকবে বাড়ি। মাটির ওপরে পানিস্তর একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছলে বাড়িটিও ধীরে ধীরে ওপরের দিকে ভেসে উঠবে। বাড়িটি মাটির তলায় লোহার রডের সাথে ক্যাবল দিয়ে আটকানো অবস্থায় থাকে। পানির ওপর প্রায় পাঁচ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বাড়িটি ভেসে উঠতে পারে। পানি কমে যাওয়ার সাথে সাথে বাড়িটি আবার মাটিতে নেমে আসবে। যত রকমের বৈদ্যুতিক সংযোগ তা বাড়ির ওপরের দিকেই থাকবে, যাতে ভেসে ওঠার সময় পানির সংস্পর্শে এসে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হত্যার ব্যাপারে ইয়াযীদ ও সীমারকে দোষারোপ করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। বস্তুত তার হত্যার ব্যাপারে তারা কতটুকু দোষী বা প্রকৃত দোষী কে? সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আবু আব্দুল্লাহ
ঢাকা।

উত্তর : খলীফা ইয়াযীদের শাসনামলে ৬১ হিজরীর ১০ মুহাররম ইরাকের কারবালা নামক স্থানে হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে হত্যা করা হয়। তবে তার হত্যার ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্রও দায়ী ছিলেন না। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, নিশ্চয় ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে হত্যার নির্দেশ দেননি। তিনি ওবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে কেবল ইরাক দখল করা হতে বাধা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন (মাজমূউল ফাতাওয়া, ৩/৪১১ পৃ.)। তিনি আরো বলেন, হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর স্ত্রী-পুত্রগণ যখন ইয়াযীদের নিকট পৌঁছলেন, তখন তিনি তাদের অনেক সম্মান করেছেন এবং নিরাপত্তার সাথে তাদেরকে পুনরায় মদীনায় পৌঁছে দিয়েছেন (প্রাগুক্ত)।

ইতিহাসগ্রন্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হত্যার ব্যাপারে প্রকৃত দোষী দুইজন। ওবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ ও সীমার। কারণ কূফাবাসীর বায়আত গ্রহণের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যখন তিনি তথায় আগমন করেন এবং তার সাথে বেঈমানী করত তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন ওবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ কূফার গভর্নর ছিল এবং সে সরাসরি যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। আর সীমার সরাসরি হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৮/২১৪ পৃ.)।

প্রশ্ন (২) : কোনো মুসলিম যখন নিজেকে অমুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দিবে বা ধর্মত্যাগ করবে, তখন কি তাকে কাফের বলা যাবে?

-আফতাব
জামালপুর।

উত্তর : কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবী করা অবস্থায় যদি সঠিক মনে করে দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয় এমন কোনো কাজ করে তথাপি তাকে কাফের বলা যাবে না। কিন্তু যদি নিজেকে কাফের বলে ঘোষণা করে অথবা শরীআতের কোনো কিছুকে অস্বীকার করে; তখন তাকে কাফের বলাতে বাধা নেই। কেননা এমন ব্যক্তি স্বঘোষিত মুরতাদ/কাফের। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি স্বধর্ম হতে ফিরে যায় এবং ঐ কাফের অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে তাহলে তার ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে' (আল-বাক্বারা, ২/২১৭)।

প্রশ্ন (৩) : যদি কোনো ব্যক্তি মূসা (আলাইহিস সালাম) ও ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহর নবী হিসেবে সাক্ষ্যও দেন আবার ভালোবাসেন তাহলে কি সে ইয়াহূদী ও নাছারাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ল? অন্যান্য নবীগণকে কি আমরা ভালোবাসতে পারব নাকি কেবল সত্যায়ন করব আল্লাহর বান্দা ও নবী হিসেবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজশাহী।

উত্তর : আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্যান্য যত নবীর কথা জানা যায় সকল নবীকে বিশ্বাস করতে হবে এবং নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর তাদেরকে ভালোবাসার অর্থ তাদের প্রতি ঈমান রাখা। তবে অনুসরণ করতে হবে শুধু শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর। কেননা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমণের পর অন্য কোনো নবীর অনুসরণ জায়েয নয়। এমনকি অন্য কোনো জীবিত থাকলে তাদের জন্যও মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ ছাড়া গতি থাকতো না। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাওরাতের একটি নুসখা/কপি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি তাওরাতের একটি নুসখা। তখন (একথা শুনে) তিনি চুপ করে থাকলেন। তখন উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তা পাঠ করতে শুরু করলেন এবং এতে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন (তা দেখে) আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, সন্তানহারা শোক তোমাকে আচ্ছন্ন করুক! তুমি কি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারার দিকে তাকাওনি? তখন উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আল্লাহর নিকট আল্লাহর গযব ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, সেই সত্তার কসম! আজ যদি মূসাও প্রকাশিত হতেন আর তোমরা তাকে অনুসরণ করতে এবং আমাকে পরিত্যাগ করতে, তবে অবশ্যই তোমরা সরল-সোজা পথ হতে বিচ্যুত হতে। আর যদি তিনি জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়তী সময় পেতেন, তবে তিনি অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন' (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/২৬৪৬১)।

প্রশ্ন (৪) : এমন কী কী কুফুরী কাজ রয়েছে যা অজ্ঞাতসারে করলেও মানুষ ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে যায়?

-আফতাব
জামালপুর।

উত্তর : ঈমান ভঙ্গের অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১০টি কারণ উল্লেখ্য করা হলো যেগুলো কোনো ব্যক্তি করলে সে দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে। হোক সে জেনে-বুঝে করুক কিংবা না জেনে করুক। সেই কাজগুলো হলো : ১. আল্লাহর ইবাদতে শরীক বা অংশীদার স্থাপন করা। ২. যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কাউকে মাধ্যম তৈরী করে তাদেরকে ডাকে এবং তাদের নিকট শাফাআত কামনা করে। ৩. যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করে অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদসমূহ সঠিক মনে করে। ৪. যদি কোনো মুসলিম নবী করীম ﷺ-এর দেখানো পথ ব্যতীত অন্য কোনো পথ পরিপূর্ণ অথবা ইসলামী হুকুমাত বা বিধান ব্যতীত অন্য কারো তৈরী হুকুমত উত্তম মনে করে। ৫. যদি কোনো মুসলমান আল্লাহর নবী ﷺ-এর আনিত বিধানের কোনো অংশকে অপছন্দ করে তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যদিও সে ঐ বিষয়ে আমল করে। ৬. যদি কোনো মুসলিম মুহাম্মাদ ﷺ আনিত ধর্মের কোনো বিষয়ে অথবা ধর্মীয় ছওয়াব বা শাস্তির ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ৭. যদি কেউ যাদুর মাধ্যমে ভাল কিছু অর্জন বা মন্দ কিছু বর্জন করতে চায় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন বা ভাঙ্গন ধরাতে গোপন, প্রকাশ্য মন্ত্র-তন্ত্র করতে চায় অথবা কারো সাথে (ছেলে-মেয়ে) সম্পর্ক স্থাপন বা বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে চায়। ৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। ৯. যে ব্যক্তি মনে করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরীআত ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মে জীবন পরিচালনা করলেও জান্নাত পাওয়া যাবে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব। ১০. আল্লাহ মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া (আর-রাসাইলুস-ছাখসিয়্যা, ২১২-২১৪; মাজমুআতু রাসায়েল ফিত-তাওহীদে ওয়াল ঈমান, ৩৮৫ পৃ.; নাওয়াক্বিযুল ইসলাম, ২ পৃ.)।

প্রশ্ন (৫) : সমাজে প্রচলিত আছে, 'মা মারা গেলে দুধ খাওয়া যাবে না। আর বাবা মারা গেলে কলা খাওয়া যাবে না'। উক্ত বিশ্বাস কি ঠিক?

-হোসেন মোবারক
চিলমারী, কুড়িগ্রাম

উত্তর : উক্ত আক্বীদা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তা সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। ইসলামে কুসংস্কারের কোনো স্থান নেই। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ 'ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছুই নেই, অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই, পেঁচার অনিষ্ট কিংবা ছফর মাসের পেটের পীড়া বলতে কিছুই নেই' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২২২০)।

প্রশ্ন (৬) : কাফেরদের অনুসরণের জন্য যদি কাউকে নিষেধ করা হয় তখন কেউ কেউ বলে থাকে, আমরা তো কাফেরদের তৈরি করা অনেক কিছুই ব্যবহার করে থাকি এই ক্ষেত্রে কি তাদের অনুসরণ করা হচ্ছে না?

-রাহাত
মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : কাফেরদের কাজ মূলত তিন ধরনের হয়ে থাকে। (১) ইবাদতগত (২) স্বভাবগত/আক্বীদাগত (৩) কর্ম ও শিল্পগত। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাদের অনুরসণ করা হারাম। এ ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুশরিক হয়ে শিরকে লিপ্ত হলে আল্লাহ তার কোনো আমলই গ্রহণ করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মুশরিকদের থেকে পৃথক হয়ে মুসলিমদের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে' (ইবনু মাজাহ, হা/২৫৩৬)। অন্যত্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)। তবে কর্ম ও শিল্পগত বিষয়গুলো বৈধ যদি ইসলাম সে ব্যাপারে নিষেধ আরোপ না করে থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ ও আহলে কিতাবদের খাবারসমূহ হালাল করে দেওয়া হলো এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্যও হালাল করে দেওয়া হলো' (আল-মায়েদা, ৫/১০৭)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুশরিকা মহিলার পানি হতে ওযূ করেছিলেন এবং এক ইয়াহূদী মহিলার হাদিয়াও গ্রহণ করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩১৬৯; ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৪; বুলূগুল মারাম, হা/২২)। উক্ত আয়াত ও হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের তৈরি খাবার কিংবা অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করাতে শারঈ কোনো সমস্যা নেই। তবে মুসলিমদের তৈরিকৃত খাবার ও জিনিসসমূহ ব্যবহার করাই উত্তম (আবূ দাঊদ, হা/৩৮৩৯; তিরমিযী, হা/১৫৬০)।

প্রশ্ন (৭) : নযর মানলে কি মহান আল্লাহ আশা পূরণ করেন?

-আব্দুর রহমান
ময়মনসিংহ।

উত্তর : আসলে আল্লাহর সাথে শর্তভিত্তিক চুক্তির নযর মাকরূহ অথবা হারাম। যেমন, আল্লাহ! যদি আমার ছেলে পাশ করে, তাহলে তোমার রাহে হাজার টাকা দেব। আমার রোগী সেরে উঠলে এত টাকা দান করব ইত্যাদি। এতে কোনো লাভ হয় না। যা হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছা ও তাক্বদীরে হয়। নযর না মানলেও তাই হয়। ইবনু উমার বলেন, মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নযর কোনো অমঙ্গল আনয়ন করে না, তার মাধ্যমে কেবল বখীলের মাল বের করে নেওয়া হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬০৮, ৬৬০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩৯)।

তবে ইবাদতের নযর মানলে তা পূরণ করা জরুরী। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার নযর মানে, সে যেন (তা পূরণ করে)। তার আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করার নযর মানে, সে যেন (তা পূরণ না করে এবং) তাঁর অবাধ্যতা না করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৬; আবূ দাঊদ, হা/৩২৮৯; তিরমিযী, হা/১৫২৬)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এক মহিলা সমুদ্র সফরে বের হলে সে নযর মানল যে, যদি আল্লাহ তাআলা

তাকে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ দান করেন, তাহলে সে একমাস ছিয়াম রাখবে। অতঃপর সে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু ছিয়াম না রেখেই সে মারা গেল। তার এক কণ্যা নবী ﷺ-এর নিকট এসে সে ঘটনা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, 'মনে কর, তার যদি কোনো ঋণ বাকী থাকত, তাহলে তা তুমি পরিশোধ করতে কি-না? সে বলল, হ্যা। তিনি বললেন, 'তাহলে আল্লাহর ঋণ অধিকরূপে পরিশোধ যোগ্য। সুতরাং তুমি তোমার মায়ের তরফ থেকে ছিয়াম কাযা করে দাও' (আবূ দাঊদ, হা/৩৩০৮; মুসনাদে আহমাদ, ১/২১৬, হা/১৮১৬)।

প্রশ্ন (৮) : কাফের মুশরিকরাও কি হাশরের মাঠে আল্লাহকে দেখতে পাবে।

-মাহফুজুর রহমান
ঢাকা।

উত্তর : না; কাফের-মুশরিকদের কেউ আল্লাহকে দেখতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'কক্ষনো নয়; অবশ্যই সেদিন তারা তাদের রবের সাক্ষাৎ হতে অন্তরীণ থাকবে। অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (আল-মুত্বাফফিফীন, ৮৩/১৫-১৬)। বরং এ নে'মত শুধু মুমিনদের জন্য। কেননা আল্লাহর দর্শন জান্নাতের সবচেয়ে বড় নে'মত। আর জান্নাতের কোনো নে'মত কাফেরদের কপালে জুটবে না। রাসূল ﷺ বলেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا 'অতিসত্ত্বর তোমরা তোমাদের রবকে স্বচক্ষে দর্শন করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৯৮)। অন্য হাদীছে রয়েছে, 'অতিসত্ত্বর তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা এই চন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছ' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৩৩)।

ইবাদাত- ছালাত

প্রশ্ন (৯) : জুমুআর ছালাতের জন্য যখন আযান দেয় তখন যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আযানের উত্তর দিবে না-কি ২ রাকআত ছালাত আদায় করবে?

-মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
ধনবাড়ি, টাংগাইল।

উত্তর : আযান চলাকালীন তাহিয়্যাতুল মসজিদ না পড়ে বরং আযানের জওয়াব দেওয়া ও আযান শেষের দু'আ পড়া উত্তম। আযানের জওয়াব ও দু'আ শেষে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে। কারণ এ ইবাদত চলন্ত অবস্থায় রয়েছে যার উত্তর দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেছেন এবং তার অনেক ফযীলতও রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন তার জওয়াবে বলো মুয়াযযিন যা বলে। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়ো। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট 'অসীলা' চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মাত্র একজন বান্দার জন্য উপযোগী। আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'অসীলা' চাইবে তার জন্য আমার শাফাআত জরুরী হয়ে যাবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৪; মিশকাত, হা/৬৫৭; ফাতাওয়া উছায়মীন, ১২/১৯৩)। অতঃপর আযানের দু'আ পড়ার পর তাহিয়্যাতুল মসজিদ ছালাত আদায় করে বসবে। আবূ ক্বাতাদা সালামী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন বসার পূর্বে দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৪; মিশকাত, হা/৭০৪; ফাতাওয়া উছায়মীন, ১২/১৯৩)।

প্রশ্ন (১০) : ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলা শুরু করেছে কিন্তু এখনও শেষ করেনি। এমতাবস্থায় কোনো মুক্তাদী এসে রুকূতে শামিল হলে সে কি রুকূ পেল?

-আব্দুল আওয়াল
ঝিকরগাছা, যশোর

উত্তর : না; এমন পরিস্থিতিতে কেউ ইমামকে পেলে সে রুকূ পেয়েছে বলে গণ্য হবে না। বরং ঐ ব্যক্তি রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে যে, ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেয়েছে। আর ইমামের **'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ'** বলার অর্থ হচ্ছে রুকূ এর সমাপ্তি। একথাই হাদীছে বলা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি রুকূ পেল সে রাকআত পেল' (আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৯৩৪৯)। مَن أدرَكَ الرَّكعَةَ قَبلَ أن يَرفَعَ الإمامُ رأسَه فقَد أدرَكَ السَّجدَةَ 'যে ব্যক্তি ইমাম মাথা উত্তোলনের পূর্বে ইমামকে (রুকূতে) পেল, সে সাজদা তথা রাকআত পেল (সুনানুল কুবরা, বায়হাক্বী, হা/২৫৮৬ 'সনদ জায়্যেদ')।

বরং ইমামের সাথে পূর্ণাঙ্গ রুকূ পেলে অথবা এক তাসবীহ পাঠ করার সুযোগ পেলে তার জন্য তা রুকূ হিসাবে গণ্য হবে (আল-মুমতে', ৪/২৪৪ পৃ.)। অর্থাৎ রুকূর পর ইমামকে পেলে তা তার রাকআত গণ্য হবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমরা সিজদারত অবস্থায় তোমরা যখন ছালাতে আসবে, তখন সিজদা করবে। তবে তাকে কোনো কিছু (রাকআত) গণ্য করবে না (আবূ দাঊদ, হা/৮৯৩)।

প্রশ্ন (১১) : সিজদারত অবস্থায় দুই পায়ের পাতা বা টাখনু মিলিয়ে রাখতে হবে নাকি পৃথক রাখতে হবে?

-আব্দুল্লাহ শেখ
শেখপাড়া, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ছালাতে সিজদারত অবস্থায় দুই পায়ের পাতা মিলিত থাকবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي، فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমার সাথে আমার বিছানাতে ছিলেন। কিন্তু তাকে আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। (অন্ধকারে খুঁজতে গিয়ে) আমি

সিজদারত অবস্থায় পেলাম, তখন তার দুই গোড়ালি মিলিত অবস্থায় ছিল, আর আঙ্গুলগুলো ক্বিবলার দিকে মুখ করা ছিল।...' (ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/৬৫৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬৬১৪; সুনানে কুবরা, বায়হাক্বী, হা/২৭৬০)। ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছের পূর্বে অধ্যায় রচনা করেছেন, بابُ ما جاءَ في ضَمِّ العَقِبَيْنِ في السُّجودِ 'সিজদায় দুই গোড়ালি মিলিয়ে রাখা সম্পর্কে'।

প্রশ্ন (১২) : রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন। এই বিষয়ে মুসনাদে আহমাদে ওয়াইল বিন হুজর থেকে যে হাদীছ এসেছে তা কি ছহীহ?

-মুহাম্মাদ আফনান রাফিদ
বংশাল, ঢাকা

উত্তর : মুসনাদে আহমাদে ওয়ায়েল বিন হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৮৭০; দারেমী, হা/১৩৯৭; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/৭১৪)। হাদীছটিতে দুই সিজদার মাঝে আঙ্গুল নাড়ানোর যে বিষয়টি বুঝা যায়, তা মূলত তাশাহহুদের সাথে সম্পর্কিত। অনেক ইমাম উক্ত হাদীছটি তাশাহহুদের বৈঠকের অধ্যায়ে উল্লেখও করেছেন। যেমন, ইমাম ইবনু খুযায়মা (রহিমাহুল্লাহ) তার ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে (১/৩৭৫) বলেন, بَابُ صِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ وَتَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا 'তাশাহহুদে দুই হাঁটুর উপর দুই হাত রাখা ও ইশারার সময় তর্জনী আঙ্গুল নাড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে'। ইমাম বাগাবী (রহিমাহুল্লাহ) তার মাছাবীহুস সুন্নাহ (১/৩৪৬) এর মধ্যে বলেন, باب التشهد। ইমাম আব্দুল হক্ব আন্দালুসী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'আল আহকামুল কুবরা' গ্রন্থে (২/২৬৬) বলেন, بَاب صفة الْجُلُوس للتَّشَهُّد وَالْإِشَارَة। ইমাম হাসান ইবনু আহমাদ আছ-ছান'আনী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'ফাতহুল গাফফার' গ্রন্থে (১/৩৭৯) বলেন, باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين حال التشهد والإشارة بالسبابة অর্থাৎ ইমামগণের এসকল অধ্যায় রচনা থেকে বুঝা যায়, এটা শেষ বৈঠকের বিষয়। তাছাড়া যদি এটাকে দুই সিজদার মাঝের বৈঠক ধরা হয়, তাহলে ওয়ায়েল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীছে ছালাতের বিবরণ শেষ পর্যন্ত না থেকে সিজদার বৈঠকে গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে এটা ধরে নিতে হবে। অথচ তার হাদীছের ছালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে এটাই বুঝা যায়। তাই এটাকে দুই সিজদার মাঝের বৈঠক না ধরে শেষ বৈঠক ধরাই ভালো হবে। -ওয়াল্লাহু আ'লাম।

প্রশ্ন (১৩) : মহিলারা বাড়িতে একা একা ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-নিজাম উদ্দিন
চট্টগ্রাম।

উত্তর : মহিলাগণ পর্দাসহ পুরুষদের সাথে ঈদগাহে ঈদের ছালাত আদায় করবে এটিই শরীআতের নির্দেশ। উম্মু আত্বিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ঈদের দিনে ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে মুসলিমদের জামা'আতে ও দু'আয় অংশ নিতে বের করে নেওয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো। তবে ঋতুবতীগণ যেন ছালাতের জায়গা হতে একপাশে সরে বসেন। একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো কারো (শরীর ঢাকার জন্য) বড় চাদর নেই। তিনি বললেন, 'তাঁর বান্ধবী তাঁকে আপন চাদর প্রদান করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/ ৩৫১; মিশকাত, হা /১৪৩১)। অত্র হাদীছে ঋতুবতী নারীদেরকেও ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যা নারীদের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার গুরুত্বও প্রমাণ করে। কোনো কারণে ঈদগাহে যেতে না পারলে প্রথম রাকআতে ৭ এবং দ্বিতীয় রাকআতে ৫ মোট বারো তাকবীরে দুই রাকআত ছালাত বাড়িতে আদায় করে নিবে (মির'আতুল মাফাতীহ, ৫/৬৫ পৃ.)। গ্রামের সকল মহিলাগণ একত্র হয়ে এক জায়গায় ঈদের ছালাত আদায় করার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তা কোনো ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং তা বিদআত (ফাতাওয়া নূর আলাদ-দারব ইবনু উছাইমীন, ৮/১৮৯ পৃ.)।

প্রশ্ন (১৪) : মিলাদ-ক্বিয়াম করে এমন ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-হামীম
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : দায়িত্বশীলদের জন্য ছহীহ আক্বীদার ইমাম নিয়োগ দেওয়া জরুরী। আর মুছল্লীদের জন্য উচিত ছহীহ আক্বীদার ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করার চেষ্টা করা। তবে মিলাদ ক্বিয়ামকারী ব্যক্তির পিছনে ছালাত আদায় করে ফেলে তাহলে, ছালাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ ইমামের পাপ মুক্তাদীর উপর বর্তাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'কেউ কারো গুনাহের বোঝা বহন করবে না' (আল-আনআম, ১৬৪)। তার ভুলের কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু অন্য মুছল্লীদের ছালাত হয়ে যাবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তারা তোমাদের ছালাত আদায় করায়। সুতরাং যদি তারা ঠিকভাবে ছালাত আদায় করায়, তাহলে তোমাদের ও তাদের ছওয়াব হবে। আর যদি ভুল করে, তাহলে তোমাদের ছওয়াব হবে এবং এর দায় তাদের উপর বর্তাবে' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৬৪৮)।

প্রশ্ন (১৫) : জুমু'আর দিন মুআযযিন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আযান দিবে?

-মো. মাহমুদুল হাসান
ময়মনসিংহ।

উত্তর : আযান অর্থ এ'লান করা বা ঘোষণা দেওয়া। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যে, ছালাতের সময় আরম্ভ হয়ে গেছে। সুতরাং উচ্চ আওয়াজে এমন স্থান থেকে আযান দেওয়া জরুরী যেন তার শব্দ ও বাক্যসমূহ

মানুষের নিকট পৌঁছায়। আর এজন্যই বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। নাজ্জার গোত্রের জনৈক মহিলা ছাহাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে নববীর নিকটবর্তী ঘরসমূহের মধ্যে আমার বাড়ি ছিল সবচেয়ে উঁচু। বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) সেখানে উঠে ফজরের আযান দিতেন (আবূ দাঊদ, হা/৫১৯)। যদি এমন কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে মসজিদের যে কোনো স্থান থেকে আযান দিতে পারে। আর যেহেতু এখন মাইকের ব্যবস্থা আছে সুতরাং মসজিদের যেকোনো স্থান হতে আযান দিতে পারে। আর জুম'আর দিন খত্বীবকে সামনে করে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার ব্যাপারে আবূ দাঊদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি শায (আবু দাঊদ হা/১০৮৮)।

প্রশ্ন (১৬) : বিড়াল পোষা নিয়ে ইসলাম কী বলে? আর বিড়াল ঘরে থাকলে উক্ত ঘরে ছালাত হবে কি?

-সাখাওয়াত
কালিয়াকৈর গাজিপুর।

উত্তর : ইসলামী শরীআতে বিড়াল পোষা জায়েয। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নিজে বিড়াল পুষতেন (তাদরীবুর রাবী, ৭৭২ পৃ.)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে তা থেকে কখনো নিষেধ করেননি। এছাড়াও বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা বিড়াল পালনের বৈধতা পাওয়া যায়। যেমন, দাঊদ ইবনু ছালেহ ইবনু দ্বীনার আত-তাম্মার হতে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত, একদা তাঁর মনিব তাকে আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর নিকট 'হারিসাহ'-সহ প্রেরণ করেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট পৌছে দেখতে পাই যে, তিনি ছালাতরত আছেন। তিনি আমাকে হারিসার পাত্রটি রাখার জন্য ইশারা করলেন। ইত্যবসরে সেখানে একটি বিড়াল এসে তা হতে কিছু খেয়ে ফেলল। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) ছালাত শেষে বিড়ালটি যে স্থান হতে খেয়েছিল সেখান হতেই খেলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'বিড়াল অপবিত্র নয়। এরা তোমাদের আশেপাশেই ঘুরাফেরা করে'। অতঃপর আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করতে দেখেছি (আবূ দাঊদ, হা/৭৬; মিশকাত, হা/৪৮৩)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কাবশা বিনতু কা'ব ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, আবূ ক্বাতাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একদিন তাঁর নিকট আগমন করেন। তারপর কাবশা কিছু কথা বলেন, যার অর্থ হচ্ছে, আমি আবূ কাতাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর জন্য ওযূর পানি রাখি। ইত্যবসরে একটি বিড়াল এসে পাত্র থেকে পানি পান করে। আবূ ক্বাতাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) পাত্রটি কাত করে দিলে বিড়ালটি পানি পান করে। কাবশা বলেন, আবূ ক্বাতাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আমাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভাতিজী! (আমি বিড়ালকে পাত্র থেকে পানি পান করিয়েছে দেখে) তুমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, 'বিড়াল অপবিত্র নয়। কারণ যেসব প্রাণী প্রতিনিয়ত তোমাদের আশে পাশে থাকে, তাদের মধ্যে বিড়ালও একটি' (আবূ দাঊদ, হা/৭৫; তিরমিযী, হা/৯২)।

মসজিদ

প্রশ্ন (১৭) : মসজিদের মেঝেতে নকশাওয়ালা জায়নামায খচিত টাইলস্ লাগানো যাবে কি? এ বিষয়ে ছহীহ দলীল ভিত্তিক উত্তর দিলে উপকৃত হবো।

-মোহাম্মাদ আলী
নওগাঁ।

উত্তর : ছালাতের খূশূ-খূযূ নষ্টকারী কোনো কিছু মসজিদের মেঝেতে, সামনে রাখা যাবে না। সুতরাং মসজিদের মেঝেতে নকশাওয়ালা জায়নামায খচিত টাইলস ব্যবহার করা যাবে না। কেননা এর মাধ্যমে অনেক সময় মুছল্লী তার ছালাত হতে অমনোযোগী হয়ে পড়েন। যা ইসলামে নিষিদ্ধ। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর নিকট একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দার কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের এক দিকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দা সরিয়ে নাও। কারণ ছালাত আদায়ের সময় এর ছবিগুলো আমার চোখে পড়তে থাকে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৭; মিশকাত, হা/৭৫৮)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'এই চাদরটি আমার ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট করছে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৬)। অন্যত্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'আমাকে চাকচিক্যময় করে মসজিদ বানানোর নির্দেশ দেয়া হয়নি'। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, তোমরা (অচিরেই) মসজিদসমূহকে এমনভাবে সুসজ্জিত ও কারুকার্যময় করবে, যেরূপ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা (তাদের উপাসনালয়) সুসজ্জিত করে থাকে। (আবূ দাঊদ, হা/৪৪৮)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন, 'ক্বিয়ামত ততদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতদিন পর্যন্ত না মানুষ মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে' (আবূ দাঊদ, হা/৪৪৯)।

পারিবারিক বিধান- বিবাহ-তালাক

প্রশ্ন (১৮) : কেউ কি তার স্ত্রীর বাবার নতুন বিয়ে করা বউকে তালাকের পর বিয়ে করতে পারবে? বা এক কথায় মেয়ে ও তার সৎ মাকে একত্রে বিবাহ করতে পারবে? যদি জায়েয হয় এর কি কোনো নজির আছে?

-আব্দুস সালাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর: সামাজিক কিছু আপত্তি থাকলেও শরীআতে স্ত্রীর সৎমা মাহরাম হিসাবে বিবেচিত নয়। তাই তাকে বিয়ে করা জায়েয। কারণ কোনো ব্যক্তি মাহরাম কি না তা শুধুমাত্র শরীআতের দলীল দ্বারাই প্রমাণিত হতে হবে। আর মাহরামের তালিকায় স্ত্রীর সৎমায়ের কথা বলা হয়নি (আন-নিসা, ৪/২৪)। তাই অধিকাংশ আলেমদের মতে একই সাথে একজন মহিলা এবং তার পিতার তালাক দেওয়া অন্য স্ত্রীকে

বিয়ে করাও বৈধ (জামেউল উলূম ওয়াল হুকম, পৃ. ৪১১; আল-উম্ম, ৭/১৬৩; আল-মুহাল্লা, ৯/৫৩২)। তাছাড়া ইবনু কুদামা (রহিমাহুল্লাহ) ও জায়েয বলেছেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর ও ছফওয়ান ইবনু উমাইয়া বিবাহ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন (আল-মুগনী, ৭/৯৮)।

প্রশ্ন (১৯) : বৃদ্ধ বয়সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি মেলামেশা না থাকে তারা যদি এক বিছানায় না ঘুমায় তাহলে কি ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ হবে?

-মোঃ মুরসালিন
চাপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর: শুধু মেলামেশার জন্য এক বিছানায় থাকতে হবে একথা নয়। বরং স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগী। সুতরাং তারা এক সাথে থাকবে এটাই শরীআতের নির্দেশ। আর এর মাধ্যমে উভয়ের মাঝে সম্প্রতি ও ভালোবাসা তৈরী হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ 'এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন' (আর-রূম, ২১)। সূরা আল-বাকারার মধ্যে মহান আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের পোশাক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন (আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)। এ থেকে বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী মৃত্যু পর্যন্ত এক বিছানায় থাকবে। কেননা পৃথক বিছানায় থাকলে স্বামী-স্ত্রী একজন আরেক জনের জন্য কষ্ট পেতে পারে। ভালোবাসার কমতি দেখা দিতে পারে। আর তা যদি কোনো রাগ কিংবা ঝগড়ার কারণে হয়, তাহলে স্ত্রী আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত স্ত্রী হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তাতে অসম্মতি জানায় আর এতে তার স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রযাপন করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য অভিশাপ করতে থাকে' (বুখারী, হা/৩২৩৭; মুসলিম, হা/১৪৩৬; মিশকাত, হা/৩২৪৬)। সুতরাং এক সাথে থাকাই শরীআতের নির্দেশ। তবে প্রয়োজনে সাময়িক সময়ের জন্য মনোমালিন্য ছাড়া ভিন্ন বিছানায় থাকতে পারে।

প্রশ্ন (২০) : কোনো বিধবা কিংবা ডিভোর্সি মহিলা কি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করতে পারবে? যদি বিবাহ করে তাহলে, শরীআতের দৃষ্টিতে এই বিবাহ শুদ্ধ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: কুমারী হোক কিংবা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হোক কোনো নারীর জন্য পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করা বৈধ নয়। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যেকোনো নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে, তার বিবাহ বাতিল! তার বিবাহ বাতিল! তার বিবাহ বাতিল!' (তিরমিযী, হা/১১০২; মিশকাত, হা/৩১৩১)। উল্লেখ্য, বিধবা নারী নিজের ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে বেশি হক্বদার (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪২১)। মর্মে বর্ণিত হাদীছের আলোকে কেউ কেউ বিধবা নারীর একাকী বিবাহ করার বৈধতা দিয়েছেন। কিন্তু তা সঠিক অর্থ নয়। বরং এর সঠিক অর্থ হলো, সে পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে অধিক হক্বদার। একাকী বিবাহ করার ব্যাপারে নয় (নায়লুল আওতার, ৬/১৪৩ পৃ.; সুবুলুস সালাম, ২/১৭৫ পৃ.)।

ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন (২১) : আমি একজন ফার্মাসিস্ট। আমার কাছে এসে অনেকে বাচ্চা নষ্ট করার ওষুধ চায়, এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?

-হাসিবুর রহমান
কোতোয়ালি, যশোর।

উত্তর : সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজেই কেবল সহযোগিতা করা যায়। অসৎকর্ম ও আল্লাহদ্রোহিতার কাজে সহযোগিতা করা জায়েয নয় (আল মায়েদা, ৫/২)। সুতরাং যে সকল বস্তু কেবল পাপকাজের জন্যই তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে কল্যাণকর কোনো দিক নেই এসকল পণ্য বিক্রয় করা যাবে না। যেমন, ভ্রূণ নষ্ট করার ওষুধ, আত্মহত্যা করার ওষুধ, বিষ কিংবা যন্ত্র, মাদকদ্রব্য, কোনো উপকার নেই এমন কেমিক্যাল ইত্যাদি। ভ্রূণ নষ্ট করা নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 'দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা করো না' (আল-ইসরা, ১৭/৩১)। তিনি অন্যত্র বলেন, 'যখন জীবন্ত পুঁতে-ফেলা কন্যা শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? (আত-তাকবীর, ৮১/৮-৯)।

প্রশ্ন (২২) : আমি একজন ফুল বিক্রেতা। এখন আমি ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর যদি ফুল বিক্রি করি, তাহলে কি আমার রূযী হালাল হবে?

-মো. আশরাফুল ইসলাম
শ্রীপুর, মাগুরা।

উত্তর : নির্ধারিত দিনে ফুলের মাধ্যমে যা কিছু করা হয় তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নির্ধারিত দিনে ফুল বিক্রয় করলে শিরকের কাজে সহযোগিতা করা হবে। আর আল্লাহ পাপ কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আর তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। পাপকর্ম ও আল্লাহদ্রোহিতার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। তাই নির্ধারিত দিনে ফুল বিক্রি করা যাবে

না। আর এমন উপায়ে উপার্জিত রূযী হালাল হবে না।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (২৩) : পরীক্ষায় নকল করা, অন্য কারো দেখে লেখা, কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়া বা কাউকে কিছু বলে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিতে জানতে চাচ্ছি?

-মো: আব্দুল্লাহ আল আরিফ
ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : পরীক্ষায় নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতার বাইরে অন্য যেকোনো ভাবে কোনো কিছু উত্তরপত্রে লিখা নাজায়েয। এর মাধ্যমে অন্য ভাইয়ের হক্ব বিনষ্ট করা হয়। তাছাড়া তা সুস্পষ্ট প্রতারণা। রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের আদর্শভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১; ইবনু মাজাহ, হা/২২২৫)।

প্রশ্ন (২৪) : আমি একজন গুনাহগার বান্দা। আমি একটি সূদী ব্যাংকের ম্যানেজার। আমি যখন চাকরিতে আসি তখন বুঝতে পারিনি এর ইনকাম হালাল না। এখন আমার করণীয় কী? বর্তমান চাকরিটা ছাড়তেও পারছি না।

-মোঃ আশরাফুল ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর : সূদ একটি গর্হিত অপরাধ যা ধনীকে ধনী বানায় আর গরীবকে গরীব বানায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূদগ্রহীতা, সূদ দাতা, এর সাক্ষী এবং এর লেখক সবাইকে অভিশাপ করেছেন (তিরমিযী, হা/১২০৬; ইবনু মাজাহ, হা/২২৭৭)। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সূদকে ধ্বংস করে দেন এবং ছাদাক্বা বৃদ্ধি করেন...' (আল-বাক্বারা, ২/২৭৬)। অতএব আপনাকে সূদ ভিত্তিক চাকরি ছেড়ে দিয়ে তওবা করে ফিরে আসতে হবে এবং অন্য কোনো বৈধ উপার্জনের পদ্ধতি বের করে রিযিক্ব অন্বেষণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'প্রতিপালক! আমরা ভুলে গেলে অথবা ভুল করলে আমাদের পাকড়াও করো না' (আল-বাক্বারা, ২/২৮৬)। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহর যমীন প্রশস্ত'। তিনি আরো বলেন, 'অতএব তোমরা আল্লাহর যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং তার রিযিক্ব তালাশ করো (আল-জুমু'আ, ৬২/১০)। আর যা হয়ে গেছে তার জন্য তওবা করবে। আল্লাহ ক্ষমা করবেন ইনশা-আল্লাহ। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হলো, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে' (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)।

প্রশ্ন (২৫) : পানি পান করার সময় যদি গোঁফ ভিজে যায় তাহলে, কি সেই পানি পান করা হারাম হবে?

-আল আমিন হোসেন
পাবনা।

উত্তর: পানি পান করার সময় গোঁফ ভিজে গেলে সেই পানি পান করা হারাম একথা দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয়। কেননা, শরীআতের মূলনীতি হলো কোনো কিছু হারাম হওয়ার জন্য দলীল লাগবে। আর গোঁফ ভেজা পানি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলীল নেই। সুতরাং গোঁফ ভেজা পানি হারাম হবে না। তবে গোঁফ ছেঁটে রাখার ব্যাপারে গুরত্বারোপ করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা গোঁফ ছোট করো এবং দাড়ি ছেড়ে দাও' (মুসনাদে আহামাদ, হা/৭১৩২)।

প্রশ্ন (২৬) : হাঁস বা মুরগিকে যদি গুইসাপে কামড় দিয়ে মাথা নিয়ে যায় আর ওটাকে জীবিত পাওয়া যায়, তবে কি তা খাওয়া যাব?

-শাহনাজ বেগম
মুন্সিগঞ্জ।

উত্তর: না, খাওয়া যাবে না। কেননা কোনো হালাল প্রাণী বা পাখি খাওয়া হালাল হওয়ার জন্য বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করা শর্ত। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা খাও যবেহকৃত সে প্রাণীর গোশত যা যবেহর সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তথা বিসমিল্লাহ বলা হয়েছে' (আল-আনআম, ১১৮)। তিনি আরো বলেন, 'যা হিংস্র প্রাণী খেয়েছে তা খাওয়া হারাম তবে যদি তোমরা তা যবেহ কর, (তাহলে খেতে পার)' (আল-মায়েদা, ৫/৩)। সুতরাং এখানে যেহেতু যবেহ করার সুযোগ হয়নি, তাই এ হাঁস বা মুরগি মৃত প্রাণির অন্তর্ভুক্ত যা খাওয়া হারাম (আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব, ৯/৭২; আশ-শারহুল মুমতে', ১৫/৫৩)।

প্রশ্ন (২৭) : ভিনেগার খাওয়া কি হালাল হবে?

-শেহা খান
জার্মানী।

উত্তর: হালাল হবে। যদি তা আপেল, আঙুর ইত্যাদি হালাল ফলমূল থেকে প্রস্তুতকৃত হয়। আর ভিনেগার বা সিরকায় ব্যবহারিত উপাদানগুলো মদের পর্যায়ভুক্ত নয়। রাসূল ﷺ ভিনেগারকে উত্তম তরকারি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'সিরকা কতই না চমৎকার তরকারি' (তিরমিযী, হা/১৭৩৯; আবূ দাঊদ, হা/৩৮২০)। আর যদি তা মদ হতে তৈরি হয়, তাহলে তা খাওয়া যাবে না। আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ﷺ-কে কতিপয় ইয়াতীম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তারা উত্তরাধিকার সূত্রে মদ পেয়েছিল। তিনি বললেন, 'তা ঢেলে

ফেলে দাও। আবূ তালহা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, আমি কি একে সিরকায় রূপান্তরিত করতে পারব না? তিনি বললেন, না' (আবূ দাঊদ, হা/৩৬৭৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৮৩; মুসনাদে দারেমী, হা/২১৬১)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, মদ বা হারাম বস্তু দ্বারা তৈরিকৃত ভিনেগারসহ যেকোনো পানীয় পান করা নিষিদ্ধ।

শিক্ষা-সংস্কৃতি

প্রশ্ন (২৮) : মেয়েদের কি মেসে রেখে একা একা পড়াশোনা করানো কি জায়েয? ইসলাম এটাকে কি সমর্থন করে?

-রেদোয়ান আহমেদ
নওগাঁ।

উত্তর: নারীদের জন্য মাহরাম ব্যতীত একদিন-একরাতের বেশি দূরত্বে সফর করা হারাম। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে নারী আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে তার জন্য একদিন-একরাতের দূরত্বে মাহরাম ব্যতীত সফর করা হালাল নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৯; ছহীহ বুখারী, হা/১০৮৮)। তাই অবাধ ঘোরাফেরার সুযোগ আছে এমন পরিবেশে মেয়েদের রেখে পড়ালেখা করানো জায়েয নয়। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠান মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং অবাধ চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে, সেই সাথে মেয়েদের যাতায়াতের সময় মাহরাম সাথে থাকে সেসব প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করানোতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে, মাহরাম ছাড়া মেয়েরা থাকতে পারে। আদি ইবনু হাতেম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, [হে আদি ইবনু হাতেম!] 'তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে দেখবে একজন উষ্ট্রারোহী হাওদানশীল মহিলা হীরা হতে রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে যাবে। এতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪০০; কুবরা বায়হাক্বী, হা/১০১৩১)।

প্রশ্ন (২৯) : সহশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকতা করা কি বৈধ হবে?

-মো. রাহুল চৌধুরী
চট্টগ্রাম।

উত্তর: বেগানা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার একটি ক্ষেত্র হচ্ছে সহশিক্ষা ব্যবস্থা। আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা শরীআতে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বরং এক্ষেত্রে অবাধ মেলামেশার সকল পথ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবাধ মেলামেশা বন্ধের জন্য মহান আল্লাহ নারীদের ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ অর্থাৎ 'তারা যেন তাদের বাড়িতে অবস্থান করে'। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ 'নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে নগ্নতার প্রতি ক্ষিপ্ত করে তুলে' (তিরমিযী, হা/১১৭৩ 'সনদ ছহীহ'; মিশকাত, হা/৩১০৯)। এই হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'নারী পর্দাবিহীন অবস্থায় বের হলে শয়তান তাকে পাপের উপর ক্ষিপ্ত করে'। নারী-পুরুষের সহবস্থানের ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'অবশ্যই কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হলে তৃতীয় জন হবে শয়তান' (তিরমিযী, ১১৭৩, সনদ ছহীহ; মিশকাত, হা/১৩১৮)। এই হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষদেরকে অপর কোনো নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং শয়তান তাদেরকে বিপদগামী করবে বলে সাবধান করেছেন। সুতরাং এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি না করে বৈধ পন্থায় ভিন্ন পথে রিযিক্ব অন্বেষণ করতে হবে।

প্রশ্ন (৩০) : খ্রিষ্টানদের পরিচালিত স্কুলে বিনা খরচে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করানো জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: পড়ানো জায়েয হবে না। কেননা এসব প্রতিষ্ঠান সুকৌশলে মানুষকে খ্রিষ্টান বানায়। তাই এমন প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে পড়ালে পাপের সহযোগিতা করা হয়। আর পাপ কাজে সহযোগিতা করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর' (আল-মায়েদা, ৫/২)। তাছাড়া বিধর্মীদের প্রভাব তার উপরে পড়তে পারে।

প্রশ্ন (৩১) : আমি একটি সরকারি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এখানে ছেলে-মেয়ে সবাইকে একসাথে পড়ানো হয়। ইসলামী শরীআহ মোতাবেক আমার এখন কী করা উচিত?

-আব্দুর রাজ্জাক
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর: এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা ছেলে-মেয়ে একসাথে পড়ালেখা করা ইসলামে হারাম। কারণ এতে ফেতনা, বিশৃঙ্খলা ও হারাম কাজের প্রসার হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আর তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে অবস্থান কর, প্রাচীন অজ্ঞতার যুগের মতো প্রদর্শনী করে বেড়াবে না' (আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, তোমার কন্যাদেরকে আর মুমিনদের নারীদেরকে বলে দাও— তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়, এতে তাদের চেনা সহজতর হবে' (আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা যখন তাদের কাছে কোনো কিছু চাও তখন পর্দার আড়াল হতে তাদের কাছে চাও। এটাই তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতর' (আল-আহযাব, ৩৩/৫৩)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

‘আমি আমার পরে পুরুষদের উপর মেয়েদের চায়তে অন্য কোনো বড় ক্ষতিকর ফেতনা রেখে যায়নি’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯৬)। অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন, ‘তোমরা দুনিয়া ও নারীদের থেকে বেঁচে থাকো। কারণ সর্বপ্রথম বাণী ইসরাঈলে ফেতনা সংঘটিত হয়েছিল নারীদের ক্ষেত্রে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৪২)। সুতরাং শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সরকারের জন্য জরুরী নারী-পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা।

প্রশ্ন (৩২) : ঝড়-বাতাসে পড়ে যাওয়া অথবা এমনিতেই পড়ে থাকা পাকা আম কুড়িয়ে খাওয়া অথবা বিক্রি করা জায়েয হবে কি?

-মো. জাকারিয়া
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর: পথিক ক্ষুধার্ত হলে তার জন্য বাগানের গাছে থাকা ফল কিংবা নিচে পড়ে থাকা ফল খাওয়া জায়েয। তবে শর্ত হলো, তিনবার উচ্চ কণ্ঠে বাগান মালিককে ডাক দিতে হবে। আর পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আমর ইবনু শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ –কে গাছে থাকা ফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি প্রয়োজনে পড়ে সেখান থেকে মুখে কিছু খেল, তার কোনো অপরাধ নেই। তবে যে ব্যক্তি সেখান থেকে কিছু নিয়ে চলে গেল, তার উপর দ্বিগুণ জরিমানা ও শাস্তি আরোপিত হবে’ (আবূ দাঊদ, হা/৪৩৯০)। তাই প্রয়োজন না হলে অর্থাৎ ক্ষুধার্ত না হলে খাওয়া যাবে না। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ‘যখন কোনো বাগানের প্রাচীরের কাছে আসবে, তখন বাগানের মালিককে তিনবার ডাক দাও। যদি সাড়া দেয় তো ভালো। অন্যথা খেতে পার। তবে কোনো কিছু বিনষ্ট না করে’ (ইবনু মাজাহ, হা/২৩০০)। আর যা গাছ থেকে পড়ে থাকে তা খাওয়া যায়।

মৃত্যু-কবর-জানাযা

প্রশ্ন (৩৩) : মহিলা মারা গেলে তার লাশ কবরে নামানোর ক্ষেত্রে কারা দায়িত্ব পালন করবে?

-আবূ বকর
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর: দাফনে পারদর্শী ব্যক্তিই লাশ কবরস্থ করার দায়িত্ব পালন করবে। এক্ষেত্রে মাহরাম আর গায়রে মাহরাম বিবেচ্য নয়। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ –এর কন্যার জানাযায় উপস্থিত হলাম। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ কবরের নিকট বসা ছিলেন। আমি দেখলাম তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরছে। অতঃপর তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে কি কেউ এমন আছে, যে গত রাতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়নি? আবূ ত্বলহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, হ্যাঁ, আছি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি। তিনি বললেন, (মাইয়্যেতকে কবরে রাখার জন্য) তুমিই কবরে নামো। তখন তিনি কবরে নামলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৬৬৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৬৭৫)। এই হাদীছে আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী কন্যার মাহরাম ছিলেন না। তবে, মাহরামের মধ্যে এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলে তা উত্তম। কাসেম ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূল ﷺ –এর মৃত্যুর পর যে স্ত্রী মারা যান, তিনি হলেন যায়নাব বিনতু জাহাশ। ...তার মৃত্যুর পর উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল ﷺ –এর অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, কে তাকে গোসল দিবে, তাকে কর্পূর লাগাবে এবং কাফন দিবে? তারা বললেন, আমরা। তারা সে দায়িত্ব বাস্তবায়ন করলেন। আবার সংবাদ পাঠালেন কে তাকে কবরস্থ করবে? তারা বললেন, তার জীবদ্দশায় তার সাথে যাদের সাক্ষাৎ করা বৈধ ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা বললেন, হে লোক সকল! তোমরা সরে যাও। সকলকে কবরের পাশ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর দুই জন তার পরিবারের (মাহরামের) দুই জন পুরুষ তাকে কবরস্থ করলেন (জামেউল আহাদীছ, হা/৩১২৬৬; কানযুল উম্মাল, হা/৩৭৭৯৭)।

প্রশ্ন (৩৪) : জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহা ও ক্বেরাআত পাঠের পর তাকবীর দেওয়ার সময় আবারও হাত উঠাতে হবে, না-কি হাত বাঁধা অবস্থাতেই তাকবীর দিবে?

- ফয়সাল আহমেদ
ঢাকা।

উত্তর: জানাযার ছালাত চার তাকবীরের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। যার প্রত্যেক তাকবীরের পর হাত উত্তোলন করতে হবে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূল ﷺ ...জানাযার ছালাতের প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন’ (আল-মু‘জামুল আওসাত্ব, হা/৮৪১৭)। নাফে‘ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে হাত উত্তোলন করতেন (মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/১১৭২০; আল-জামেউছ ছহীহ লিস-সুনানে ওয়াল মাসানীদ, ২৮/৪৫৯, হাদীছ ছহীহ)। এছাড়াও ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা সহ প্রমুখ ছাহাবীগণ জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠাতেন (নায়লুল আওতার, ৫/৭০-৭১)।

প্রশ্ন (৩৫) : শুনেছি কবরের মধ্যে বান্দার রূহকে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দেহ তো পচে যায়। আবার দুর্ঘটনাবশত কারোর দেহই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে কবরে দেহে রূহ ফেরানোর সঠিক ব্যাখ্যা কী?

-রাহুল হোসেন
পাবনা।

উত্তর: আমরা মৃত মানুষকে যে কবরে দাফন করি তাকে শুধু কবর বলা হয় বিষয়টি এমন নয়। বরং কবর দ্বারা ‘আলামুল বারযাখ’ তথা আত্মার জগতকে বুঝানো হয়। আর আলামুল

বারযাখ হচ্ছে, মৃত্যুর পর থেকে হাশরের ময়দানের উদ্দেশ্যে উঠার মধ্যবর্তী পুরো সময়টাকে বুঝানো হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বারযাখ’ (আল-মুমিনূন, ২৩/১০০)। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘মানুষকে যখন কবরস্থ করার পর তার দেহে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তার নিকট দুই জন ফেরেশতা আসে এবং তাকে উঠিয়ে বসায়। অতঃপর প্রশ্ন করে... (কানযুল উম্মাল, হা/৪২৪৯৫; মিশকাত, হা/১৬৩০)। সুতরাং মৃত্যুর পর মানুষকে দাফন করা হোক, আগুনে-পানিতে হারিয়ে যাক, হিংস্র কোনো প্রাণি তাকে খেয়ে ফেলুক তার দেহকে মহান আল্লাহ একত্র করে তার দেহে রূহ ফিরিয়ে দিয়ে তার হিসাব-নিকাস নিবেন। সে জান্নাতী হলে আলামে বারযাখে সে জান্নাতের সুখ আস্বাদন করতে থাকবে। আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে (আবূ দাউদ, হা/৪৭৫৩; আহমাদ, হা/১৮০৬৩; মিশকাত, হা/১৩১)।

প্রশ্ন (৩৬) : মৃত ব্যক্তিকে ‘মরহূম’ বা ‘মরহূমা’ বলা যাবে কি?

-মো. রিফাত আলম
দিনাজপুর।

উত্তর: মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ‘মরহূম’ শব্দের ব্যবহার আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। শব্দটি আরবীতে ইসমে মাফঊলের ছীগাহ। যার অর্থ অনুগ্রহপ্রাপ্ত, দয়াপ্রাপ্ত ইত্যাদি। কিন্তু মৃত ব্যক্তি অনুগ্রহ ও দয়া পেয়েছে কি না, তা জানা সম্ভব নয়। বিধায় মরহূম শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়। তাছাড়া এভাবে বলাটা অনেকটা গায়েবের বিষয়ে সংবাদ দেওয়ার নামান্তর। আর গায়েবের জ্ঞানের দাবি করা তো শিরক। কারণ গায়েবের সংবাদ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না (আল-আনআম, ৬/৫৯; আল-জিন, ৭২/২৬)। রাসূল ﷺ কাউকে এভাবে বলতে নিষেধ করেছেন। আনছারী মহিলা ও নবী ﷺ-এর নিকট বায়আতকারী উম্মুল আলা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, (মদীনায় হিজরতের পর) লটারির মাধ্যমে মুহাজিরদের বণ্টন করা হচ্ছিল। তাতে উছমান ইবনু মাযঊন রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদের অংশে পড়লেন, আমরা তাঁকে আমাদের গৃহে স্থান দিলাম। এক সময় তিনি সেই রোগে আক্রান্ত হলেন, যাতে তাঁর মৃত্যু হলো। যখন তাঁর মৃত্যু হলো এবং তাঁকে গোসল করিয়ে কাফনের কাপড় পরানো হলো, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রবেশ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবুস সায়েব! আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! আপনার ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তখন নবী ﷺ বললেন, ‘তুমি কী করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আল্লাহ আর কাকে সম্মানিত করবেন? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তার ব্যাপার তো এই যে, নিশ্চয় তাঁর মৃত্যু হচ্ছে এবং আল্লাহর কসম! আমি তার জন্য কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহর কসম! আমি জানি না আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হবে, অথচ আমি আল্লাহর রাসূল। সেই আনছারী মহিলা বলেন, আল্লাহর কসম! এরপর হতে কোনো দিন আমি কোনো ব্যক্তিকে সম্বন্ধে পবিত্র বলে মন্তব্য করব না (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭১৪)। তাই উত্তম হলো— শরীআতে প্রমাণিত ‘গফারাল্লাহু লাহু’ (غَفَرَ اللهُ لَهُ) ও ‘রহিমাহুল্লাহ’ (رَحِمَهُ اللهُ) ও ‘রহমাতুল্লাহি আলাইহি’ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) শব্দগুলো বলা। হাদীছের বিভিন্ন জায়গায় এই শব্দগুলো দিয়ে বিভিন্ন জনকে দু‘আ দেওয়া হয়েছে।

বৈধ-অবৈধ

প্রশ্ন (৩৭) : ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর সেবা গ্রহণ করা যাবে কি? এতে কি কোনো ক্ষতির আশঙ্কা আছে?

-আব্দুল গফূর
চট্টগ্রাম।

উত্তর: ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর সেবা গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা জরুরী। কেননা এটি খ্রিষ্টান কর্তৃক শিশুদের মাঝে পরিচালিত একটি সংস্থা। এতে ক্ষতির যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। কেননা শিক্ষার নামে মুসলিম শিশু-কিশোরদের ঈমান হরণ করাই এর অন্যতম লক্ষ্য। কারণ তারা কখনোই মুসলিমদের মঙ্গল সাধনে চেষ্টা করে না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা অধিক ভয়াবহ। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে। শোনো, তোমরাই তো তাদেরকে ভালোবাস এবং তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না’ (আলে ইমরান, ৩/১১৮-১২০)।

প্রশ্ন (৩৮) : অনুষ্ঠান-আনুষ্ঠানিকতায় বা খেলাধুলার জয়-পরাজয়ে হাত তালি দেওয়ার বিধান কী?

-ইমরান
ঢাকা।

উত্তর: হাত তালি দেওয়া একটি জাহেলী প্রথা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘কাবাগৃহে তাদের ছালাত বলতে ছিল শুধু শিস দেওয়া ও হাত তালি দেওয়া’ (আল-আনফাল, ৮/৩৫)। সুতরাং শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়; বরং ইবাদতের বাইরেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান, খেলাধুলা কিংবা আনন্দদায়ক কোনোকিছু দেখে হাত তালি দেওয়া জায়েয নয়। কারণ এতে জাহেলী যুগের মুশরিক ও বর্তমান যুগের অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা হয়। যা বর্জন করা আবশ্যক। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/৫১১৫; আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭)।

প্রশ্ন (৩৯) : বহু মালিক আছে যারা কর্মচারীদের বেতন দিতে গড়িমসি করে বা দেরি করে। এতে কি তারা গুনাহগার হবে না?

-আব্দুর রহমান
নওগাঁ।

উত্তর: অবশ্যই তারা গুনাহগার ও যালেম। **প্রথমত,** সে মহানবী ﷺ-এর আদেশের খেলাপ করেছে। তিনি বলেছেন, ‘মজুরকে তার ঘাম শুকাবার পূর্বেই তোমরা তার মজুরি দিয়ে দাও (ছহীহুল জামে‘, হা/১০৫৫)। **দ্বিতীয়ত,** সে সেই ব্যক্তির খাদ্য আটকে রাখে, যার খাবারের দায়িত্ব তার ঘাড়ে আছে এবং সেই বেতনে আরো অনেক মানুষের খোরপোশ আছে। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যার আহারের দায়িত্বশীল, তাকে তা না দিয়ে আটকে রাখে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৯৬)। অন্যত্র তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘ধনী ব্যাক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা যুলুম’ (ছহীহ বুখারী, হা/২২৭০; ইবনু মাজাহ, হা/২৪০৪)। **তৃতীয়ত,** বেতন না পেয়ে মনের কষ্টে কর্মচারী বদ-দু‘আ করতে পারে। আর সে যদি অত্যাচারিত হয়, তাহলে সে বদ-দু‘আ সাথে সাথে মালিককে লেগে যাবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, ‘তিনটি দু‘আ এমন আছে, যার কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। ১. অত্যাচারিতের দু‘আ, ২. মুসাফির ব্যাক্তির দু‘আ এবং ৩. সন্তানের জন্য তার পিতা-মাতার দু‘আ বা বদ-দু‘আ’ (তিরমিযী, হা/৩৪৪৮; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৬২; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৭৯৭)।

মীরাছ

প্রশ্ন (৪০) : কোনো বাবা যদি তার ছেলের পরিবারে ৫০ হাজার টাকার ফার্নিচার কিনে দেয় তাহলে কি তার মেয়ের পরিবারে ২৫ হাজার টাকার ফার্নিচার কিনে দেওয়া আবশ্যক?

-খসরুল আলম
মাগুরা।

উত্তর: পিতা ছেলে-মেয়েকে সামাজিক কোনো ক্ষেত্রে অস্থায়ী কোনো সম্পদ দিতে চায়লে মেয়েকে তার অর্ধেক দিতে হবে বা মেয়েকে দিতে চায়লে ছেলেকে তার ডবল দিতে হবে এমনটি জরুরী নয়। তবে স্থায়ী কোনো সম্পদ দিতে চায়লে অবশ্যই মেয়েকে ছেলের অর্ধেক দিতে হবে। নু‘মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং বললেন যে, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তিনি বললেন, ‘তোমার সকল পুত্রকে এরূপ দান করেছো কি?’ তিনি বললেন, না। রাসূল ﷺ বললেন, ‘তাহলে তা ফিরয়ে নাও’ (বুখারী হা/২৫৮৬-৮৭; মুসলিম, হা/১৬২৩; মিশকাত, হা/৩০১৯, ‘উপহার ও হেবা’ অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন (৪১) : পিতার সম্পত্তির মধ্যে বোনের প্রাপ্য অংশ বোনের সম্মতিক্রমে কম প্রদান করা জায়েয হবে কি?

-মোস্তাফিজুর রহমান
ঢাকা।

উত্তর: পিতার মৃত্যুর পর তার সন্তানগণ তার সম্পদের অধিকারী হয়ে যায়। যার মধ্যে অংশ হিসাবে বোন ভাইয়ের অর্ধেক পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পিতার প্রাপ্ত সম্পদ যদি তার মোট সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ অথবা তার কম হয় তাহলে, বোন চায়লে ভাইকে দিয়ে দিতে পারে। তার বেশি হলে বেশি অংশ দিতে পারবে না। সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি বললাম, যে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার সমুদয় সম্পদ দান করে দিব? তিনি বললেন, ‘না’। আমি বললাম, তবে অর্ধেক? তিনি বললেন, ‘না’। আমি বললাম, তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ; এক-তৃতীয়াংশ দিতে পার। আর এক-তৃতীয়াংশই বেশি (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৬১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৫)।

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ

প্রশ্ন (৪২) : আমি দরিদ্র ঘরের সন্তান। অন্যের বাড়িতে কাজ করে যে টাকা উপার্জন করি, সেই টাকা আমি আমার বাবার হাতে তুলে দিই। আমার বাবা সেই টাকা অবৈধ পথে খরচ করে (তাস খেলে) ফলে কোনো কোনো দিন আমাদের না খেয়ে থাকতে হয়। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

-আজাদ
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর: সন্তানের উপার্জিত অর্থ বাবাকে দিয়ে দিতে হবে বিষয়টি এমন নয়। বরং পিতার অসহায়ত্বে তার সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্ব সন্তানের। সুতরাং এমতাবস্থায় সন্তানের উপার্জনই যদি সংসারের খরচের একমাত্র উৎস হয় তাহলে, সন্তান তার উপার্জন দ্বারা পরিবারের খরচ বহন করবে। সাথে পিতা-মাতাকে সসম্মানে রাখবে। তাদের প্রয়োজন পূরণ করবে ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো’ (আল-ইসরা, ১৭/২৩)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তার নাক ধুলোয় ধুসরিত হোক! তার নাক ধুলোয় ধুসরিত হোক! তার নাক ধুলোয় ধুসরিত হোক!’ বলা হলো, সে কে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, ‘যে তার

পিতা-মাতা দুজনকে অথবা কোনো একজনকে পেল, কিন্তু সে জান্নাতে যেতে পারল না' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫১)। তাই এমন পিতাকে টাকা না দিয়ে উত্তমভাবে তাদের দেখাশুনা করবে।

ছবি-মূর্তি

প্রশ্ন (৪৩) : 'আমাদের পাঠ' বইয়ে বিভিন্ন মূর্তি ও হাতে আঁকা ছবি আছে, এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

-রাতিন
ঢাকা।

উত্তর: এমন বই গ্রহণ করা যাবে না। কেননা ছবি-মূর্তি শিরকের উৎস। আর শরীআতের দৃষ্টিতে মূর্তি বানানো এবং প্রাণির ছবি অঙ্কন করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। এ মর্মে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি প্রদান করা হবে ছবি অঙ্কনকারীদের' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০)। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে পৃথিবীতে কোনো ছবি অঙ্কন করবে তাকে ক্বিয়ামতের দিন তার রূহ দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করা হবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১১০)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ছবি হলো মাথা। অতএব যখন মাথা কেটে দেওয়া হয় তখন আর ছবি থাকে না' (সুনানুল কুবরা, হা/১৪৯৭৪)। অতএব বই ডিজাইনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের উচিত প্রাণির ছবিমুক্ত ভিন্ন ডিজাইনে অথবা মাথাবিহীন ছবি অঙ্কন করে বই ছাপানো। তবে নিরুপায় অবস্থার বিষয়টি ভিন্ন।

বিবিধ- কুরবানী, ইতিহাস, যিকির-আযকার, ইসলামী অনুশাসন

প্রশ্ন (৪৪) : আব্দুল্লাহ আল-মুবাশশির নাম রাখতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মুবাশশির
কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর: ইসলামে সুন্দর নাম রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই সুন্দর অর্থপূর্ণ নাম রাখতে হবে। 'মুবাশশির' শব্দের অর্থ 'সুসংবাদদাতা', যা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁকে তা দান করেছেন (আল-ফুরক্বান, ২৫/৫৬)। তাই মুবাশশির নাম রাখা বা যুক্ত করার চেয়ে ছাকিব (উজ্জ্বল), নাজীব (সম্ভ্রান্ত, অভিজাত) কারীম (সম্মানিত), ফাহীম (বুদ্ধিমান) প্রভৃতি নাম যুক্ত করা ভালো। উল্লেখ্য, শুধু আব্দুল্লাহ নাম রাখা হলেই বেশি উত্তম হবে। কারণ তা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় নামের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো— (১) আব্দুল্লাহ (২) ও আব্দুর রহমান' (আবূ দাঊদ, হা/৪৯৪৯; তিরমিযী, হা/২৮৩৩)।

প্রশ্ন (৪৫) : 'রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন গারে ছাওরে ছিলেন তখন তার মুখে মাকড়সা জাল বুনেছিল এবং কবুতর ডিম পেড়েছিল' এ কথার সত্যতা কী? ২. 'গারে ছাওরে যেই সাপ আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দংশন করেছিল তা দীর্ঘদিন যাবৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দর্শনের জন্য অপেক্ষায় ছিল' এ কথা কি সত্য?

-মো. ফাবিয়ান হোসেন
ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: গারে ছাওরে মাকড়সার জাল বুনানোর ঘটনাটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে (মুসনাদে আহমাদ, হা/৩২৫১; ফাতহুল বারী, ইবনু হাজার, ৭/২৩৬; মিশকাত, হা/৫৯৩৪)। এই হাদীছটিকে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী ও হাফেয ইবনু কাছীর রাহিমাহুমাল্লাহ হাসান বলেছেন। অন্যদিকে ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ যঈফ বলেছেন। গুহার মুখে কবুতরের ডিম পাড়ার কথা ইমাম হায়ছামী রাহিমাহুল্লাহ মাজমাউয যাওয়ায়েদে (হা/৫৪১৯) এবং ইমাম বাযযার রাহিমাহুল্লাহ মুসনাদে বাযযারে (হা/৪৩৪৪) নিয়ে এসেছেন। কিন্তু উভয়ে সনদে মুছআব আল-মাক্কী রয়েছেন। তিনি মাজহূল (অপরিচিত) রাবী । আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সাপে দংশন করার ঘটনাটি ইমাম বায়হাক্বী (দালায়িলুন নবুওয়াহ, ২/৪৭৭), আল্লামা সামারক্বান্দী রাহিমাহুল্লাহ (বাহরুল মুহীত, ২/৫৯) সহ অনেক বিদ্বান বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনো বিবরণই ছহীহ নয়। শায়খ মাশহূর সালমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এর সনদ খুবই দুর্বল' । শায়খ সাঊদ আল-খালাফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এর সনদ দুর্বল'। এ কারণে ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'জেনে রাখো! গুহা মুখে মাকড়সার জাল ও দুই কবুতর সম্পর্কে কোনো ছহীহ বর্ণনা নেই...' (সিলসিলা যঈফা, ৩/৩৩৯, হা/১১৮৯)। সঠিক কথা হলো, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে হেফাযত করেছেন। এজন্যই আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, তাদের কেউ পায়ের দিকে তাকালেই তো আমাদের দেখে ফেলবে? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবূ বকর! ঐ দুজনের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ? (ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৫৩)। বুঝা যাচ্ছে, তাদের দেখতে পাওয়ার মাঝের প্রতিবন্ধকতা দৃশ্যমান কিছু ছিল না। বরং আল্লাহর অনুগ্রহই ছিল তাদের মাঝের প্রতিবন্ধকতা।

প্রশ্ন (৪৬) : হরিণ তো খাওয়া যায়, কিন্তু তা দিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে না কেন?

-মাযহারুল ইসলাম
নোয়াখালী।

উত্তর: শরীআতে যে পশু দ্বারা কুরবানীর কথা উল্লেখ আছে সে পশু দ্বারাই কুরবানী করতে হবে অন্য কোনো হালাল পশু দ্বারা কুরবানী করলে কুরবানী হবে না। যেমন: হাস, মুরগি,

কবুতর, হরিণ ইত্যাদি। কেননা এগুলো দ্বারা কুরবানী দেওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা যে গৃহপালিত জন্তু রিযিক্ব হিসেবে দান করেছি তা কুরবানী করার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করে’ (আল-হজ্জ, ২২/৩৪)। এই আয়াতে ‘বাহিমাতুল আনআম’ দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণি হতে উট, গরু ও ছাগল উদ্দেশ্য (ইবনু কাছীর, ৫/৩৬৬; ফাতহুল কাদীর, ৩/৫৩১)। আর হাদীছের মধ্যে ভেড়া, দুম্বার কথা উল্লেখ হয়েছে তাই এগুলো দ্বারাও কুরবানী করা যাবে (আবূ দাঊদ, হা/৩১৪১; ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৪৪)। উল্লেখ্য, মহিষকে গরুর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে (আশ-শাবাকাতুল ইসলামিয়া, ১১/২০০৯৬)। সুতরাং এর বাহিরে কোনো প্রাণী দ্বারা কুরবানী করলে কুরবানী হবে না।

প্রশ্ন (৪৭) : একজন অন্যজনকে গুনাহে প্ররোচিত করলে উভয় ব্যক্তির কি সমান গুনাহ হবে?

-মাহমুদুল হক
ঢাকা।

উত্তর: পাপ কাজে সহযোগিতা করা হারাম। মাহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)। পাপকাজে প্ররোচনাকারী ব্যক্তি ডবল পাপের ভাগীদার হবে। মুনযির ইবনু জারির তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি একটি সুন্নাত চালু করল অতঃপর সে সুন্নাতের উপর আমল করা হবে, তাহলে সে এর নেকী পাবে আর যারা সে সুন্নাতের উপর আমল করবে তাদের সমপরিমাণ নেকী সে পাবে। তাদের নেকী থেকে কোনো নেকী কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি একটি পাপের কাজ চালু করল অতঃপর তার উপর আমল করা হলো, তাহলে এ পাপের বোঝা তার উপর বর্তাবে আর পরবর্তীতে যারা এ পাপ কাজ করবে তাদের পাপের বোঝাও তার উপর বর্তাবে। আর তাদের পাপ থেকে কোনো পাপ কমানো হবে না’ (ইবনু মাজাহ, হা/২০৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯২২৫)।

প্রশ্ন (৪৮) : ইসলামী আইন অমুসলিমদের জন্যও কি কার্যকর হবে?

-তাসলিমা
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর: ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল নাগরীকের উপর ইসলামী আইন প্রয়োগ করতে হবে, অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন বা আইন প্রয়োগ করা যাবে না। চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক। কেননা, ইসলামী আইন সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ বলেন, (হে মুহাম্মাদ!) আমরা আপনার নিকট সত্য দ্বীনসহকারে পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও হেফাযতকারীরূপে এ কিতাব নাযিল করেছি। অতএব আপনি আমরা যে সব বিধি-বিধান নাযিল করেছি তার ভিত্তিতে তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করুন। আপনার নিকট যে বিধি-বিধান এসেছে তা থেকে সরে গিয়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না’ (আল-মায়েদা, ৫/৪৮)। তবে তাদের উপর দ্বীন ইসলাম চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘দ্বীন পালনে কাউকে বাধ্য করা যাবে না’ (আল-বাক্বারা, ২/২৫৬)। অর্থাৎ ইসলাম যে সকল বিধান তাদের উপর কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। সকল আইন নয়। যেমন তাদের উপর যাকাত নেয় তার বদলে জিযইয়া বাস্তবায়ন করতে হবে। তাদের উপর যমীনে উশর নেয় তার বদলে ট্যাক্স দিতে হবে। তাদেরকে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ অনাদায়ে শাস্তি দেওয়া যাবে না ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৪৯) : ছালাত শেষে অথবা একা একা বসে চোখ বন্ধ করে দু‘আ-দরূদ, যিকির-আযকার করা যাবে কি?

-এম এ মজিদ
পঞ্চগড়।

উত্তর: চক্ষু বন্ধ করে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে হাদীছে নিষেধাজ্ঞা এসেছে (ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/৭১৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬২৫৯)। কিন্তু যিকিরের ক্ষেত্রে এমন নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই যিকিরের ক্ষেত্রে চক্ষু বন্ধ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (৫০) : কেউ যখন পাপ কাজে লিপ্ত থাকে (যেমন ধূমপান, কেরাম, লুডু ইত্যাদি) সে অবস্থায় কি তাকে সালাম দেওয়া যাবে?

-নাহিদ আলি
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: সালাম দেওয়ার নিষিদ্ধ কোনো সময় নেই। সুতরাং পরিচিত হোক কিংবা অপরিচিত সকলকে সালাম দিতে হবে। তাই পাপিষ্ট মুমিনকেও সালাম দেওয়া যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, ইসলামে কোন আমলটি উত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘অপরকে খাবার খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে (ছহীহ বুখারী, হা/১৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৩)। এমনকি মুমিন ও কাফের এক সঙ্গে থাকলেও সালাম দেওয়ার বিধান আছে। উছামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা রাসূল ﷺ এমন এক সমাবেশের নিকট দিয়ে গমন করলেন যেখানে মুসলিম ও মুশরিক তথা পৌত্তলিক ও ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন (বুখারী, হা/৬২৫৪; মিশকাত, হা/৪৬৩৯)।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ
জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :

Ac/Name : Al Jamiah As Salafiya General Fund
Ac/No : 20501130204367701
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

Ac/Name : Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund
Ac/No : 20501130204367417
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ, রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জ

Ac/Name : Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Ac/No : 20501130204367316
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য :

Ac/Name : Nibras Yatim Kollan Fund
Ac/No : 20501130204367600
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ
নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :

Ac/Name : Al-Itisam Dawah Fund
Ac/No : 20501130204367802
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

মানব সেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
ত্রাণ সহায়তা, অক্সিজেন বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ :

Ac/Name : Nibras Tran Tahbil Fund
Ac/No : 20501130204367903
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

Swift Code : IBBLBDDH113
Routing No: 125811932

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

bKash	রকেট পারসোনাল	bKash এজেন্ট	নগদ
01717-088967	01835-984648-7	01793-638180	01717-088967
01835-984648	01784-213178-5	01904-122546	01835-984648
01773-925235			01407-021800

bKash মার্চেন্ট : 01974-088967 (বিকাশের ৪ নং অপশান থেকে পেমেন্ট করতে হবে)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

BONOJO

Organic BONOJO ™

bonojobd.com
01704550806
/bonojobd

সুন্দরবনের
খলিশা ফুলের মধু

দেবহাটা, সাতক্ষীরা
অর্ডার করতে ফেসবুক পেজে ম্যাসেজ দিন

চাষের নয়, প্রাকৃতিক মধু

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
এর সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বইসমূহ

অর্ডার করতে নিম্নের নাম্বারগুলি ব্যবহার করুন

তাওবা পাবলিকেশন্স
TUBA PUBLICATION

রাজশাহী অফিস
নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার অফিস
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০